ইতিহাসে চাঁদপুর
(২য় পর্ব)
প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশকালঃ ইন্টারনেট সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩বাঙলা
জুন ২০০৬ইং

গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক
প্রচ্ছদে চাঁদপুর জেলার মানচিত্র

কম্পিউটারে বাঙলা কম্পোজঃ
আসিফ ইসলাম
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
জেকরা বাসেত নদী

(বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চাঁদপুর জেলার প্রবাসী ভাইবোনদের জন্যেই আমাদের এই আয়োজন।)

সকল যোগাযোগঃ

Email: marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
website : www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur
www.geocities.com/mohona_riyadh

প্রকাশকের কিছু কথা

মরুপলাশ স্বনামে ইন্টারনেটে যাত্রা শুরু করেছিলো গত ডিসেম্বর ২০০৪ইং এ। চলতি বছরের ডিসেম্বর ২০০৫ এ এসে ইহার এক বছর পূর্ণ হলো। এই চলার পথে আমরা পেয়েছি অনেক স্বজন-সুধীজনকে। যাঁদের প্রেরণা আমাদের প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। বানিয়েছে সাহসী। বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের আত্মবিশ্বাস। আমাদের একটি বদনাম আছে যে, আমরা ইতিহাস বিমুখ জাতি। এমন কথা স্বীকার করতে আমার কষ্ট হয়। কেন না 'দ্বিমাসিক ***রুপসী চাঁদপুর***' এ আমরা যখন চাঁদপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করি। তখন শত শত প্রবাসী পাঠকগন চাঁদপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের ই-মেইল করেছেন। যেহেতু আমরা চাঁদপুরের। তাই আমাদেরই পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য চাঁদপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে চর্চা করা, লেখা, গবেষণা করা এবং তা পুরো বিশ্বে সগৌরবে তুলে ধরা।

এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমি চাঁদপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। বেরিয়ে আসেন মরুপলাশকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতার জন্য একজন। হাত বাড়িয়ে দিলেন টগবগে তরুণ কম্পিউটার প্রোগ্রামার, চাঁদপুরের '***মাই কম্পিউটার***' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জনাব আসিফ ইসলাম। চাঁদপুরের ইতিহাস নিজে জানা এবং অন্যকে জানানোর তাগিদ অনুভব করেই আসিফ ইসলাম খুঁজে বের করেন আর এক চাঁদপুরের রত্ন প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে। যিনি এই গ্রন্থখানি আমাদের ***মরুপলাশ*** এবং ***রুপসী চাঁদপুর*** এর জন্য লিখেছেন।

ইতিহাসে চাঁদপুর এটি হচ্ছে ২য় পর্ব। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। ইতিহাস লেখা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। এমন বিশাল শ্রমের জন্য আমরা মরুপলাশ ও রুপসী চাঁদপুর এর পক্ষ হতে লেখক প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওনার ইতিহাস মনস্কতা, মেধা-মননকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। লেখকের কলম আরো শাণিত হোক মেহনতি মানুষের জন্যে।

আমাদের ইহাই প্রত্যাশা।

সবার মঙ্গল কামনায়-

দেওয়ান আবদুল বাসেত

সম্পাদক, মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা

রিয়াদ, সউদী আরব।

Our special thanks to Mr. Asif Islam.....

মরুপলাশ এবং ***রুপসী চাঁদপুর*** এর প্রতিনিধি আসিফ ইসলামকে জানাই অন্তবিহীন ধন্যবাদ মরুপলাশ এর জন্য তার আন্তরিকতা দেখে।

*বাংলাদেশে **মরুপলাশ** এবং **রুপসী চাঁদপুর** এর নিজস্ব প্রতিনিধি আসিফ ইসলাম*

ইতিহাসে চাঁদপুর
(২য় পর্ব ও শেষ পর্ব)
(লেখকের দেয়া নাম ছিলো ইতিহাসের বাঁক বদলে চাঁদপুর নামের জনপদ)

চাঁদপুরের সংবাদপত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ

একটি জাতির বা একটি এলাকার মানুষের জীবনমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি বেড়ে ওঠে সে এলাকার শিক্ষা সাহিত্যকে নির্ভর করে। সুবর্ণ অতীত নিয়ে মানুষ উদ্দীপ্ত হয় উল্লসিত হয়, শিক্ষা সাংস্কৃতির বিচারে অন্য জাতি বা অন্য অঞ্চলের মানুষ বর্ণিত এলাকাটিকে সম্মানের চোখে দেখে থাকে কখনো কখনো সমীহ করে। চাঁদপুর বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মানদন্ডে সফলভাবে উত্তরিয়ে যাওয়া একটি জেলা। এ জেলার রয়েছে বিশাল সাহিত্য রচিয়তা ও সাহিত্য আমোদী মানুষের দীর্ঘ তালিকা। সুদুর অতীত থেকে নিকট অতীত এবং বর্তমানে এ জেলার রয়েছে গর্ব করার মতো সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অঙ্গনে দৃপ্ত বিচরণরত অনেক সন্তান।

'চাঁদপুর ভরপুর জলে স্থলে / মাটির মানুষ আর সোনার ফলে' কবি ইদ্রিসের কালজয়ী কবিতার দু'টো লাইন উদ্ধৃত করে আমি এ অধ্যায়ে আমার জানা চাঁদপুর জেলার কবি সাহিত্যকদের কথা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। কবি ইদ্রিস মজুমদার চাঁদপুর জেলার একজন স্বনামধন্য সন্তান। তিনি বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন গুণী শিক্ষক ছিলেন। তার রচিত পংক্তির মাটির মানুষগুলোকে ঘিরে যেসব সাহিত্যকরা সাহিত্য রচনা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছেন তাদের কথা এ প্রবন্ধে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এঁদের জন্ম হয়েছে পদ্মা মেঘনা ডাকাতিয়া বিধৌত চাঁদপুর জেলার উর্বর মাটিতে একথা বলা বাহুল্য নয় তাঁরা কালজয়ী।

বহুদিন পুর্বে ফরিদগঞ্জ উপজেলায় জন্মেছিলেন পুঁথি সাহিত্যের অম্লান জোতিষ্ক দোনা গাজী। আরকান রাজসভায় মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মহা কবি আলাওল যখন সাহিত্য কর্ম শুরু করেন তার অধশত বছর আগে পুঁথি সাহিত্যে দোনা গাজীর আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের অমর কবি আলাওলের ''সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল' রচনার বহু পুর্বে দোনা গাজী রচিত পুঁথি হিসেবে ''সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল'' স্বীকৃতি পেয়েছে। যে যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন 'সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল' পুঁথি রচনার মাধ্যমে, সে যাত্রা তাঁর নিম্ন প্রজন্ম পরম্পরায় চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার হাত ধরে আজো বহমান। ফুলছোঁয়া গ্রামের সামছুল হক মোল্লা তার রচনাবলী নিয়ে আজো বেঁচে আছেন বাকিলা বাজার সংলগ্ন উত্তর পাশের শ্যামল পল্লীটিতে। ফুল ছোঁয়াকে তিনি বলে থাকেন FLOWER TOUCH, এই ফ্লাওয়ার টাচই চারণ কবির প্রেরণার উৎস।

ডাকাতিয়া মেঘনা পদ্মা বহুবার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। সে কারণে চাঁদপুরের মানচিত্রে বহুবার অনেক সংযোজন বিয়োজন হয়েছে। তারপরও সকল হাসি কান্নার মাঝে এ অঞ্চলে জীবন আজও বহমান। জীবন বয়ে চলেছে নদীর গতি প্রবাহের মতই। কখনো যা বেগবান কখনো মন্থর প্রায় স্রোতহীন। নদীর ভাঙ্গন ও দারিদ্রের মাঝে এই লোকালয়ে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্য। একথা অস্বীকার করার জো নেই। চাঁদপুরের সাহিত্য জগত অন্য অনেক কিছুর মতোই দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হয়েছে।

দুইশত বছর পুর্বের একজন কবি মীর্জা হোসেন আলী। মীর্জা হোসেন আলী বরদা খাতের জমিদার ছিলেন। তিনি কিছুকাল নারায়নপুরে ত্রিপুরা রাজের দেওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ

গুলো এখন দুস্প্রাপ্য, এই কবি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তার কাব্য ও সাহিত্য এখন লোকের মুখে মুখে স্বীয় অস্থিত্ব বজায় রেখেছে। তার অমর সৃষ্টি 'কাঞ্চন মালা' কাচিয়ারার কাঞ্চনমালার দীঘি আজও বর্তমান।

দীঘিরপাড়ে রাজ কন্যা কাঞ্চন মালার হাসির আওয়াজ পাওয়া যায় চাঁদনী রাতে এখনো রাজকল্যাণমূলক নিক্কনের শব্দ শুনতে পায় জনগণ। চাঁদপুরের মরমী কবি অবনীমোহন চক্রবর্তীর নীলসবুজের প্রাণের দোলায় ও মধুপনী উচু মানের কাব্য গ্রন্থ। কবি মমতা ঘোষ চাঁদপুরের প্রখ্যাত গবেষক ড. মনোমোহন ঘোষের সহধর্মিনী। কবি সত্যেন্দ দাস দত্ত তার মাতুল। শুভদৃষ্টি, মৌনমুখর, গীতাংশুক তার কাব্যগ্রন্থ। কবি চাপলা বসুও চাঁদপুরের মেয়ে। তার কাব্য গ্রন্থ পুষ্পাঞ্জলী, নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে চাঁদপুর চালিতাতলীর গোরচাঁদ ঘোষাল একজন বিশিষ্ট সুরশিল্পী ছিলেন। চাঁদপুর পুরাণবাজারের শৈলেন ঘোষ আর একজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। তিনি সঙ্গীত চর্চার জন্য চন্দ্রলোক সঙ্গীত সম্প্রদায় নামে একটি সঙ্গীত সংস্থা স্থাপন করেছিলেন ১৯০১ সনে। ১৯২৬ সনে বিনয়ভূষণ মুখাজীর (যাযাবর) পিতা ফনীভূষণ মখাজীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় চাঁদপুর কমার্শিয়েল ক্লাব, পরবর্তীকালে এই ক্লাব পূর্ণিমা সম্মিলনী নাম গ্রহণ করে। এই সংস্থা প্রতিটি পূর্ণিমা তিথিতে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতো এবং এরা বের করতেন বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকী। কলকাতা কেন্দ্রিক যে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিলো তার ঢেউ ভাগীরথী তট অতিক্রম করে মেঘনার তট রেখা স্পর্শ করে ছিলো।

চাঁদপুর টাউন হল স্থাপিত হয় ১৯৪২ সনে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বাবু হরদয়াল নাগের পুত্র শ্রীমনকুমার নাগ, ইন্দুভূষণ গুহ মোক্তার, সাধুচরণ ওয়াস্তী, বিমলচন্দ্র বসু ও জনাব আব্দুর রহমান। চাঁদপুর টাউন হলের পাবলিক লাইব্রেরী বিভাগ ছিলো।

টাউন হল রঙ্গামঞ্চই ছিলো চাঁদপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গামঞ্চ। এছাড়া চাঁদপুর রেলওয়ে ও চাঁদপুর বিডি হলেও রঙ্গামঞ্চ ছিলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁদপুর টাউন হল পাবলিক লাইব্রেরীর সমস্ত বই পুস্তক রাজাকার বাহিনী সের দরে ঠোঙ্গা বানানোর জন্য ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখন চাঁদপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠাগার চাঁদপুর পৌর পাঠাগার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও একটি লাইব্রেরী পরিচালনা করে থাকে।

চাঁদপুর শিল্পী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সনে, ১৯৬৬ সনে আর্টস কাউন্সিলের সহযোগিতায় এরা প্রতিষ্ঠা করে চাঁদপুর সঙ্গীত নিকেতন। এ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চাঁদপুরের শিল্পকলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রেখে চলেছেন। চাঁদপুরের আর একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান চাঁদপুর ললিত কলা। সপ্তসুর নামে একটি সঙ্গীত শিক্ষালয় অধুনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চাঁদপুরের সুরবন্ধু মজুমদার একজন বিখ্যাত সুরকার ও গীতিকার । তার বহু পল্লীগীতি ও ভাটিয়ালী রেকর্ড করা হয়েছে। তার পুত্র প্রবীর মুজমাদর একজন সুরকার ও চিত্র জগতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীত পরিচালক। তার অজস্র আধুনিক গান রেকর্ড করা হয়েছে। বোয়ালিয়ার জমিদার বাড়ির ললিত কুমার চৌধুরী একজন বিখ্যাত বেহালা বাদক। বোয়ালিয়ার মুকুল চক্রবর্তীর কীর্তনের দল বিখ্যাত ছিল।

বিখ্যাত ঢুলী ছিলেন বাবুরহাটের গোসইদাসঢুলী, রজনীঢুলা, বাঘাদির নবকুমার ঢুলী। চাঁদপুরের নয়নতারা , রাধারাণী , সুশীলা ও রাজলক্ষ্মী ছিলেন কুমিল্লা জেলার কীর্তন গায়িকা। শশী চক্রবর্তীর কীর্তনের দলও বিখ্যাত ছিল। আকাশবাণীর কণ্ঠ শিল্পী গীতাদত্ত ও শান্তি ঘোষ চাঁদপুরেরই সন্তান। চাঁদপুরের রেনুকা সেনের দুইখানি বিখ্যাত গান ''যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো'' এবং 'অতুল প্রসাদের পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাউল সম্রাট পুর্ণদাস চাঁদপুরের জামাই। তার স্ত্রী চাঁদপুরের মেয়ে মঞ্জুদাসও একজন বিখ্যাত বাউল গায়িকা। চাঁদপুরের আশালতা রায় বেতার পল্লী সঙ্গীত ও ভাটিয়ালী গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। তার সহোদর ভাস্কর মজুমদার একজন বিখ্যাত তবলচি। আশালতা রায়ের কন্যা মীরা বসুও একজন নামকরা গায়িকা। চাঁদপুরের তবলচিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মনুঘোষ, সুন্দরলাল ও পরান মল্লিক।

চাঁদপুরের একজন সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক জনাব মুসলেহ উদ্দীন। বড় শাহতলী গ্রামের এই সন্তান পাকিস্তান আমলে একজন বিখ্যাত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। বাংলা চলচিত্রের প্রবাদ তুল্য নায়িকা জহরত আরাও এই বড় শাহাতলী গ্রামের কন্যা। চাঁদপুরের জনাব আতিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী হামিদা আতিক উভয়েই বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। আতিকুল ইসলাম সাহেবের বড় ভাই অধ্যাপক রফিকুর ইসলাম সাহেবের স্ত্রী জাহানারা ইসলামও একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংঙ্গীত শিল্পী। চাঁদপুর সঙ্গীত নিকেতনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্যামল সেনগুপ্ত একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। সঙ্গীত নিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ললিত কলার অধ্যক্ষ শীতল ঘোষালের কন্যা তুি ঘোষাল বর্তমান যুগে গুনী সঙ্গীত শিল্পী।

চাঁদপুরের কালী মোহন ঘোষের কন্যা শ্রীমতি সুজাতা ঘোষ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তার ভ্রাতা শ্রী শান্তিদেব ঘোষ একজন নৃত্যশিল্পী, নৃত্যশাস্ত্র বিশারদ ও নৃত্য পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ নৃত্যনাট্যই তিনি পরিচালনা করেছেন।

উদয় শঙ্করের ভারতনাট্যমের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ছিলেন চাঁদপুরে অরুনবসু, দীন নাথ বসু ও গিরীন্দ্র বসু। এদের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

চাদপুরের স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী অঞ্জনা সাহা। চাঁদপুর পুরাণ বাজারের ভগবান বসুর কন্যা চিত্রনিভা ১৯২৮ সনে শিল্প শিক্ষার্থী হয়ে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে গিয়েছিলেন। তার নাম ছিল নিতাননী। রবীন্দ্রনাথ আদর করে তার নাম দিলেন চিত্রনিভা। চিত্রনিভা ছিলেন নন্দলাল বসুর কৃতী ছাত্রী। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। পোট্রেট অঙ্কনে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। তার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন , বিধুশেখর প্রভৃতি গৌরবের বস্তু। শান্তিনিকেতনের চিত্রশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষও ভারত বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পী শৈলেন ঘোষ চাঁদপুরের সন্তান।

চাঁদপুর বোয়ালিয়ার, আর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নিশীথ রায় চৌধুরী, তার মরুপ্রান্তরে গোধুলী এক অনুপম শিল্পকর্ম। ঐ গ্রামের সুকুমারী দেবী একজন অনন্য আলিম্পন শিল্পী। শ্রী নিকেতনের কালী মোহন ঘোষাল তাকে আবিস্কার করে শান্তি নিকেতনে নিয়ে যান। সীবন শিল্প ও চিত্রাঙ্কনেও তার নিপুণতা ছিল। তার সাহায্যে নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে আলপনা বিভাগ গড়ে তুলেন। ভারত বিখ্যাত মৃৎশিল্পী উপেন্দ্রনাথ ঘোষও চাঁদপুরের সন্তান। অবলাবসু চাঁদপুরের আর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যিনি শান্তিনিকেতনের চিত্র শিক্ষিকা ছিলেন। বর্তমানে চাঁদপুরের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খান, মনিরুল ইসলাম, সাধন চন্দ্র, মনোরঞ্জন ভৌমিক প্রমুখ। চাঁদপুরের বিখ্যাত ভাস্কর দীন নাথ কুন্ডু।

বিশ্বচরাচরের সকল কিছুর মালিক মহান আল্লাহ্ এটাই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশাস। মানুষ এবং মানুষের সর্বপ্রকার শক্তি সামর্থ , মেধা ও প্রতিভা সবই আল্লাহতালার দান। তিনি মানুষকে দিয়েছেন বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা, জ্ঞান অনুসন্দানের প্রতিভা, দিযেছেন মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ও লেখনি শক্তি। সেই আল্লাহ্ তালার গুণগান ইসলামী সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। সাহিত্য

সংস্কৃতি মূলত শিল্পকলারই বিষয়। দেশেল সকল অংশের মতো চাঁদপুরের মুসলিম সম্প্রদায় ও ১৭৫৪ সনের পর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পকলার অঙ্গন থেকে ছিটকে পড়েছিলো।

১৭৫৭ সালে যুদ্দ হয়েছিলো মুসলিম সিরাজউদৌল্লাহ ও খ্রীষ্টান কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো মুসলিম পক্ষ জিতেছিলো খ্রীষ্টান পক্ষ। যুদ্ধের উপকার ভোগী হয়েছিলো এদেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়। সাগর পাড়ের বেনিয়া ইংরেজ এদশীয় তাবেদার শ্রেণীর সাহায্য সহযোগিতায় ১৯০ বছর নির্মমভাবে শোষণ, শাসন আর অত্যাচার চালিয়েছে এদেশের মানুষের ওপর চাঁদপুরও তার বাইরে নয়। তাই বিগত দু'শতাব্দিতে সাহিত্য কর্মের গণভিত্তি খুব একটা মজবুত নয়। অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার পঞ্চান্ন শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পরও সাহিত্যিক হিসেবে অথবা সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে মুসলিম বাঙালীরা প্রায় উপেক্ষিত ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলার সাহিত্যকোশে মুসলিম প্রভা দেখাই যায় না। ছটা মন্ডলের অন্তরালেই রয়ে যায় মুসলিম জনগোষ্ঠী ।

পাকিস্তান রাষ্ট্র যন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে। চাঁদপুরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চাঁদপুরের মুসলিম লেখকদের সাহিত্য কর্ম এই দুশতক তেমন করে একটা প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজ রাজত্বের শেষ শতাব্দিতে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাই শেষ শতাব্দির মধ্য ভাগ থেকে কিছু কিছু মুসলিম শিল্প সাহিত্য সেবিকে খুঁজে পাওয়া যায়। চাঁদপুরের কবি আব্দুর রশীদ খাঁন (১৯২৭)এ সময়ের তেমনি একজন । তার কাব্যগ্রন্থ নক্ষত্র, মানুষ, মন, বন্দী মুহূর্তে, মহুয়া ও অন্বিষ্ট স্বদেশ।

চাঁদপুরের একজন স্বনামধন্য চারণ কবি শামছুল হক মোল্লা তিনি ১৯২৯ সন থেকেই লেখালিখে শুরু করেন। তার প্রথম কবিতার বই 'গীরবের কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সনে। পাকিস্তান আমলে 'ফরিয়াদ' ও 'সময়ের ডাক' নামে আরো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পর তার 'ভুলবোনা দেশের মানুষ কান্দে' নামে আরো দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার অগ্নিঝরা কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। শামছুল হক মোল্লার অজস্র লেখা সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে।

সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীন আহমদ চাঁদপুরের অপর সূর্যসন্তান, কোলকাতা থেকে তার প্রকাশিত সওগাত একটি নিভীক প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলো। বহু মুসলিম সাহিত্যিকের জন্মাদাতা এই নাসিরুদ্দীন ও তার পত্রিকা সওগাত । মুসলিম নারী জাগরণে সওগাতের ভুমিকা অনন্য। পরবর্তী কালে তার সুযোগ্য কন্যা নুরজাহান বেগম সম্পাদনা করেছেন বেগম পত্রিকা। তাঁর জামাতা রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ও একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। এদের গ্রামের বাড়ী চাঁদপুর জেলা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিলো যা মেঘনার ভাঙ্গনে মানচিত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেব চাঁদপুর-৪ আসনের সাংসদ এস. এ. সুলতান টিটুর পিতৃব্য। অনেকে বলে থাকেন সওগাত পত্রিকা না থাকলে বাঙালী জাতি নজরুল প্রতিভার সন্ধান পেতনা।

চাঁদপুরের শ্রী কেদারঘোষ ছিলেন Statesman পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক। তিনি দৈনিক বসুমতিও সম্পাদনা করতেন। চাঁদপুরের প্রবীণতম সাংবাদিক চাঁদপুর গান্ধী শ্রী হরদয়াল নাগ। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রকাশ করেন ভারত হিতেষী। চাঁদপুরের একখানা পুরানো সাপ্তাহিক পত্রিকা নববঙ্গ, ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাবু হরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, দীর্ঘকাল পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৭ সনে চাঁদপুর কলেজের উপাধ্যক্ষ আজিমুদ্দীন আহমদ সাহেবের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা আলো। পত্রিকাটি কয়েক বছর চালু ছিল।

চাঁদপুরের আর দু'জন সাংবাদিক চিত্রালী সম্পাদক জনাব এস এম পারভেজ ও আহমুদুজ্জামান চৌধুরী। ১৯৬০ সনে চাঁদপুরের মহকুমা প্রশাসক জনাব সালাহউদ্দীন আহমদ সাহেবের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক অন্যগ্রাম। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব নাজিম সেলিম বুলবুল। চাঁদপুর খ্রিস্টান মিশন থেকে অর্ধ শতাব্দি ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে নবযুগ নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রচার, মুদ্রণ সাহিত্য মান প্রশংসার দাবীদার।

স্বাধীনতার পর শাহ্ মোহাম্মদ ওবায়েদউল্লার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রক্তপলাশ ও পুরান বাজার থেকে মাহমুদ সেলিম রেজার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রক্তিম সূর্য। স্বাধীনতার পর কয়েক বৎসর যাবৎ মিঞা মোহাম্মদ আব্দুল খালেকের সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক চাঁদপুর বার্তা।

জাতীয় পর্যায়ে চাঁদপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দৈনিক ইত্তেফাকের আব্দুল ওদুদ, আব্দুল আউয়াল, দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী প্রমুখ। জনাব নুরুল ইসালাম পাটোয়ারী সাংবাদিকতা ছাড়ও লোক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। জনাব আব্দুল খালেক চৌধুরী চাঁদপুরের একজন প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন, তিনি ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত চাঁদপুর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তার আমন্ত্রণে আইয়ুব আমলে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে যোগদান করার জন্য চাঁদপুর এসেছিলেন।

আহমেদ নূরে আলম, শফিকুর রহমান, জহিরুল হক, জাকারিয়া মিলন, রেজাউল করিম, রহমান জাহঙ্গীর, সিদ্দিকুর রহমান আশরাফী, নাজিমুদ্দীনমোস্তান, সিকান্দর হায়াৎ খান, কামরুজ্জামান চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন খান, শংকর চন্দ্র দে প্রমুখ। অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী কয়েক বৎসর চাঁদপুর সাংবাদিক সমিতি ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. মুনতাসীর মানুন ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, ড. আঃ ছাত্তার ও তাদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলার সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৯৮৪ সনে নির্ভিক ও ১৯৮৫ নির্ঝর নামে দুটো সাহিত্য পত্রিকা কাজী শাহাদাতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো। অধুনা পত্রিকা দু'টো প্রকাশিত হচ্ছে না। চাঁদপুর থেকে সাপ্তাহিক চাঁদপুর ও রূপসী চাঁদপুর নামে দু'টো সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। বর্তমানে সে পত্রিকা দু'টো বন্ধ। সংবাদ পত্র ও সংবাদকর্মী দু'টোতেই চাঁদপুর জেলা অত্যান্ত সৌভাগ্যবান।

জেলা থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা হচ্ছে দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো। বর্তমানে পূর্ণাকারে বেরুচ্ছে। টেবলয়েড আকারে বেরুচ্ছে আরো ছয়টি দৈনিক পত্রিকা। ১। দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ ২। দৈনিক চাঁদপুর প্রবাহ ৩। দৈনিক চাঁদপুরজমিন ৪। দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ ৫। দৈনিক আমার চাঁদপুর ৬। দৈনিক আলোকিত চাঁদপুর (প্রকাশিতব্য)। সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে আরো পাঁচটি ১। সাপ্তাহিক দিবাচিত্র ২। সাপ্তাহিক সুদীপ্ত চাঁদপুর ৩। সাপ্তাহিক আমাদের অঙ্গীকার ৪। চাঁদপুর কাগজ। ৫। সাপ্তাহিক চাঁদপুর খবর, ফরিদগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক পল্লীকাহিনী, হাজীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক হাজীগঞ্জ, মতলব থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক মতলব কণ্ঠ।

সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন চাঁদপুর কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক কাজী শাহাদাত, ইকরাম চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া জীবন, আহছানুজ্জামান মন্টু রোকনুজ্জামান রোকন, অ্যাডঃ বিণয় ভূষণ মজুমদার, শাহ মাকসুদ

আলম, আব্দুর রহমান, লক্ষণ চন্দ্র সূত্রধর, এস. এম. আনোয়ারুল করিম, শহীদ পাটোয়ারী, আলম পলাশ, মীর্জা জাকির, গিয়াস উদ্দিন মিলন, এস. টি. শাহাদাত, শ্যামাপদ (ভুলুদা) পার্থনাথ চক্রবর্তী, ইকবাল হোসেন পাটওয়ারী, অধ্যাপক দেলোয়ার আহমেদ, শরীফ পাটোয়ারী, মনির চৌধুরী, অধ্যক্ষ জালাল আহমেদ চৌধুরী, মিজানুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, বি. এম. হান্নান, হাবিবুর রহমান, মনোয়ার কানন, রাখী সাহা প্রমুখ। চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি অ্যাডঃ ইকবাল বিন বাশার ও সাধারণ সম্পাদক ইকরাম চৌধুরী। এ. কে. এম সালাউদ্দিন সম্পাদিত পল্লী কাহিনী নামক মাসিক পত্রিকাটির কথা বলতে হয়, এটি একটি নিয়মিত প্রকাশানা।

পঞ্চাশ দশকে চাঁদপুর জেলার সাহিত্যাকাশে তথা বাংলা সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন সেরাজ উদ্দিন তালুকদার। আজ তার কথা বিস্মৃত হয়ে গেছে। চাঁদপুর জেলার নব প্রজন্ম তাঁকে চেনেই না অথচ তার একটি প্রকাশনা সংস্থা ছিলো পাকিস্তান প্রকাশনী নামে ছিলো জোড়পুকুর পাড়ে পাকিস্তান লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরী । ঐ সংস্থার ব্যানারে তার লেখা উপন্যাস কাপুরুষ, দু'ধারা, ভাবিসাব, কাশ্মিরী মেয়ে, নারী নয় রাক্ষুসী সে সময়ে দারুন সাড়া জাগিয়েছিলো।

গত ১০ জানুয়ারি তার মৃত্যু বার্ষিকী পার হয়ে গেল। লেখক ব্যক্তিগত ভাবে সেরাজউদ্দিন তালুকদার ও শামছুল হক মোল্লার স্নেহে ধন্য হয়েছেন। অধ্যাপক কবি জাকির হোসেন মজুমদারের লেখনিও সৃষ্টির অবদান চাঁদপুরের সাহিত্য অঙ্গণকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যের অপর একজন সাড়া জাগানো সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী চাদপুর জেলার সন্তান।
বিখ্যাত নজরুল গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চাঁদপুর জেলার সন্তান। মেঘনার পূর্ব পাড়ে সর্ব প্রথম ডিএসসি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তি ডাঃ আবু ইউসুফ হাবিবুর রহমান এই জেলারই সন্তান। তার লেখা বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ এদেশের বিজ্ঞান লেখার অঙ্গানে চিরভাস্মর। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতিছাত্র ছিলেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সতীর্থ এই ব্যক্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধে রেখেছেন বিরাট অবদান।

চাঁদপুরের ভেরাচাকী গ্রামের বাবু রামমোহন ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তার মোট ১৪ খানা গ্রন্থ আছে। বাংলা সাহিত্যে যাযাবর নামে খ্যাত বিণয় মুখার্জী তার লেখা 'দৃষ্টিপাত' গ্রন্থের জন্যে বাঙালীর সাহিত্য ও মননে দীর্ঘদিনের জন্যে অক্ষয় হয়ে থাকবেন। চাঁদপুরের এই সন্তান বাঙালীর হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন তার সৃষ্ট চরিত্র সুনন্দা ব্যানার্জি ও চারুদত্ত আধারকারের মতো ।

বর্তমানে চাঁদপুরের সাহিত্যাঙ্গানে অনেক নবীন ও প্রবীন সাহিত্যসেবী আছেন, যাদের লেখা প্রতিনিয়ত জেলার সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। অবিরত ধারার যারা স্রষ্টা তাদের মধ্যে আব্দুল হক মোল্লা, শামসুল হক মোল্লা, কাজী শাহাদাত, ফতেউল বারী রাজা, লিটন ভূঞা, মাহবুব আনোয়ার, জসীম মেহেদী, ফাতেমা আক্তার রুবী, প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর কবির পাটোয়ারী, এস. এম. জয়নাল আবেদিন, জীবন কানাই চক্রবর্তী , জাকির হোসেন, অধ্যাপক খন্দ. মকবুল আহমেদ, সর্দার আবুল বাশার, ডাঃ মোজাম্মেল হক পাটঃ প্রমুখ অন্যতম।

প্রযুক্তির মহাবিজয়ের যুগ এখন। ইন্টারনেট বর্তমানে বিশ্বকে বানিয়ে দিয়েছে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ'। ইহার মাধ্যমে আজ মুহূর্তে বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছা অত্যন্ত সহজ। চাঁদপুরের অনেক লেখকের সাহিত্যকর্ম তেমনি ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেইসব ওয়েব সাইট ব্রাউজিং করলে তাদের লেখা ডাউন লোড করা সম্ভব হবে। তেমনি একটি ওয়েব সাইট www.marupalash.com সৌদি আরব ভিত্তিক এ ওয়েব সাইটটি সম্পাদনা করছেন চাঁদপুরের এক

প্রবাসী কৃতিসন্তান যিনি আশির দশকের একজন বিশিষ্ট ছড়াকার। অনেক গ্রন্থের প্রণেতা জনাব দেওয়ান আব্দুল বাসেত। দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার পূর্বেই আশির দশকের গোড়ার দিকে দেওয়ান বাসেত রচিত তিনটি নাটক (ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ, অতীত কথা বলে, ঝরা মুকুল) চাঁদপুর টাউন হলে মঞ্চস্থ হয়েছিলো। তিনি তখন চাঁদপুর কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। তার এই নাটকগুলো সফল মঞ্চায়নের পেছনে যার সম্পূর্ণ সহযোগিতার হাত ছিলো, তিনি কিন্তু চাঁদপুরের না হয়েও এ কাজটি করেছেন। তিনি তখনকার সময়ে চাঁদপুর কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক প্রবীন শিক্ষাবিদ, কবি ও গবেষক প্রফেসর হেলালউদ্দিন আহমদ। যিনি চারণ কবি সামছুল হক মোল্লাকেও প্রথমে আমাদের কাছে পরিচিত করে দেন তাঁর কয়েকটি লেখায়। অধ্যাপক হেলালউদ্দিন পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজে চলে যান এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। দেওয়ান আবদুল বাসেত এর অনন্য সৃষ্ঠি ১৯৮৭ সাল হতে সউদী আরবের রিয়াদ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ম্যাগাজিন মরুপলাশ প্রিন্ট ইস্যু প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইহা পুরো মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র বর্ষীয়ান বাংলা প্রকাশনা। যা ২০০১সাল হলে লেটেষ্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করে ইন্টারনেটে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়ে আসছে। আজ **মরুপলাশ** এর লিংক বিশ্বের নামীদামী সকল ওয়েবম্যাগাজিন এবং অনলাইন পত্রিকায় রয়েছে। জনাব দেওয়ান আবদুল বাসেতের **বিটিভি**তে একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিলো ১৯৮৯সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখে কবি আসাদ চৌধুরী পরিচালিত ও উপস্থাপিত শিল্পসাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান **প্রচ্ছদ** এ। একই সালের এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রশিক্ষক মিলনায়তনে দেওয়ান আবদুল বাসেতকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। বাংলা একাডেমী লেখক অভিধানে দেওয়ান আবদুল বাসেত একজন তালিকাভুক্ত লেখক।

এই দেওয়ান আবদুল বাসেতকে আমরা একটু দেরীতেই চিনতে পেরেছি। এখানেও অধ্যাপক হেলালউদ্দিনকেই স্মরণ করতে হয়। তিনিই আমাদের কাছের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত ওয়েব ম্যাগাজিনই **মরুপলাশ** একমাত্র সাহিত্যভিত্তিক ওয়েব সাইট যা সৌদি সরকারের সেন্সর লাভ করেছে। ইতিমধ্যে প্রবাস থেকে তার সম্পাদিত অনেক লেখা দেশের সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ২০০১সাল হতে রূপসীচাঁদপুর নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রিন্ট ইস্যু প্রকাশ করে আসছেন। তবে মে ২০০৬ইং হতে **রূপসীচাঁদপুর**ও ইন্টারনেটে চালু করেছেন এবং বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল চাঁদপুর প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার **রূপসীচাঁদপুর** এ।

মরুপলাশ প্রকাশনী **ইতিহাসে চাঁদপুর (১মপর্ব) এবং (২য়পর্ব)** নামক একটি গ্রন্থ ওয়েব সাইটটিতে গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ এবং জুন ২০০৬ইং প্রকাশ করছে। সৌদি আরব ভিত্তিক এ ওয়েব সাইটটি থেকে ডাউনলোড করলেই 'চাঁদপুরের ইতিহাস'' নামক বইটি পাওয়া যাচ্ছে। বইটির লেখক প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন। চাঁদপুরের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি '০৬ ীীী.অসধফবৎঈযধহফঢ়ঁৎ.পড়স নামে একটি ওয়েব সাইট চালু হতে যাচ্ছে। সেখানে চাঁদপুর জেলা সংক্রান্ত সকল তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ওয়েব সাইটি সম্পাদনা করছেন চাঁদপুরেরই ছেলে মোঃ সফিউল আলম টিটো।

এবার ফিরে আসি এক বীরমুক্তিযোদ্ধার কথায়। Tales of millions গ্রন্থের রচিয়তা বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি যুদ্ধকালীন সময়ে ১নং সেক্টারের সেনাধক্ষ্য ছিলেন। মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম এই জেলার একজন সুসন্তান যিনি সাহিত্যিক হিসেবেও লব্ধ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসে চাঁদপুরের ভুমিকা নিয়ে একটি প্রামান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে গত ২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর। একজন সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ দেলোয়ার হোসেন খান ৪০০ পাতার এই বইটি তার যুদ্ধকালীন স্মৃতি থেকে লিখেছেন। চাঁদপুর জেলার অন্যতম কৃতি সন্তান রাজনীতির কিংবদন্তী

সাবেক প্রধান মন্ত্রী জননেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিন কাল' গ্রন্থটি একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

অতি সম্প্রতি চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত উপমা নামক সাহিত্য সাময়কিটির নজরুল জয়ন্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ''চির উন্নত মম শির'' সংখ্যাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রন্থগারে নজরুল গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন। এই সংখ্যাটি চাঁদপুরের বর্তমানকালের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ। সংকলনটি ফতেহ উল বারী রাজা ও প্রকৌঃ দেলোয়ার হোসেন এর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে অসংখ্য সাহিত্য সাময়িকী যা তুলে ধরছে চাঁদপুরের সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্যের কথা।

কবি ইদ্রিসের ভাষায় বলা যায় ''চাঁদপুর ভরপুর জুলে আর স্থলে মাটির মানুষ আর সোনায় ফলে'' এই মাটির মানুষ গুলোর অনেকেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বমহিমায় ভাস্বর। আরো অনেক কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন যারা অনবরত সাহিত্য সেবা করে যাচ্ছেন, লেখক এই মুহূর্তে তাদের নাম স্মরণ করতে পারছেন না। লেখক তার এই অপারগতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থী।

বঙ্গভঙ্গ রদ দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তানের উদ্ভব ও সার্বভৌম বাংলাদেশ

প্রতিটি জন্মের একটি প্রস্তুতি থাকে থাকে পটভূমি। জন্মের আগে রক্তপাত যেন নিয়তির বিধান, সেটা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেখানেই হোক না কেন। সহিংস অশান্তির পথ ধরেই আসে প্রাপ্তি। সময়ের প্রেক্ষিতে সে এক এক সময় এক এক রূপ পরিগ্রহ করে আজ যে নায়ক অর্জন কালে সে পরিনত হয় খলনায়কে। অনেক ইতিহাসবিদ বলে থাকেন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে প্রাপ্তি ছিলো সময়ের নিরিখে সঠিক অর্জন, আর ১৯৭১ সনের বাংলা দেশ ও সঠিক ভাবেই বাস্তবতা পেয়েছে। এদুটোর পেছনের পটভূমি বঙ্গভঙ্গ ও এর রদ। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন- সার্বভৌম রাষ্ট্রের মানচিত্র অর্জন করেছে। একটি জনগোষ্ঠীর জন্য এই বিজয় তার মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধের চরিত্র, মানচিত্র, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, সংবিধান, জাতীয় সংসদ, নির্বাচিত সরকার ইত্যাদি স্পষ্ট করে দেয়। স্পষ্ট করে দেয় তার মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরব। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনাদিকাল ধরে এই গৌরবময় চেতনা বহমান থাকে।

জাতির চেতনায় এই প্রত্যাশা অমূলক নয়। এটিই বাস্তব সত্য। আরো সত্য, যাদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, সেসব শহীদের স্মৃতিতর্পনের ভেতর দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মেকে গৌরবের উদ্দীপিত হওয়ার সাধনায় জাগিয়ে রাখা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে কিছু বাঙ্গালী পাক সেনাদের দোসর হয়েছিলো। কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ছিলো, হত্যা, ধর্ষন, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগে অংশ নিয়েছিলো তারা কারা ছিল? কেন বিরোধীতা করে ছিলো? তাদের অপরাধ কি রূপ ছিলো? তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখা একান্তভাবেই দরকার। কারন ইতিহাস আগামী প্রজন্মকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। বিপদে ভরসা যোগায়।

ইতিহাস থেকেই মানুষ আপন অস্তিত্ব খুঁজে পায়। কিন্তু আমরা সেই রকম কিছু করছি না, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে খন্ডিত করে ফেলিছি। ১৯৭১ সালে যাদের জন্ম হয়েছিলো, তাদের বয়স আজ ৩৫ যাদের বয়স ছিলো পাঁচ আজ তাদের বয়স এখন ৪০, তাদের স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ নেই। না থাকারই কথা। কিন্তু যে বিষয়টি থাকা অতীব জরুরী তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। চেতনার বয়স কখনো বাড়ে না। তরুন-যুবকদের মধ্যে বর্তমানে সেই চেতনার উপস্থিতি নেই। আর এই না থাকার কারণ আমরা আমাদের প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানতে দেইনি।

মুক্তিযোদ্ধারাও বহুধা বিভক্ত। পাননি তাঁরা প্রাপ্য মর্যাদা। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার করে তার বিস্তৃত তথ্য তালিকা, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সংস্কৃতিতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সমন্বয়ে গঠিত গবেষক দলের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যনিষ্ঠ, অনুপুঙ্খ বহুমাত্রিক সার্বিক ইতিহাস লিখতে হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে সে ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ হবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘকালীন পটভূমিগত ইতিহাস আছে। ইতিহাসের এ অংশ বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেই মূলত অনুসন্ধেয়, তবে কিছু পরিমাণে গোটা বাংলা বা উপমহাদেশের বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লি, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, আগরতলা, আসাম, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে ফাইলপত্র, আর্কাইভস, মহাফেজখানা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অফিস বা প্রধান রাজনৈতিক, তথ্যাবিজ্ঞ ব্যক্তি বা সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা তাদের লেখা বইপত্র স্মৃতিপাতায় প্রাপ্তব্য।

তাছাড়া শুধু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাস লেখার জন্য পূর্ব বাংলার সব শ্রেণী পেশার মানুষ বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি তথ্যদাতা হতে পারে। পুলিশ, সামরিক বাহিনী নানা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার চিঠিপত্র, আদেশ-নির্দেশ, ফাইল-নথি এবং বিদেশী মিশনসমূহের প্রেরিত রিপোর্ট, পত্র-পত্রিকা ও দেশি-বিদেশী সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন, ফিচার-ফটো, ফুটেজ ও তথ্য নির্দেশক সত্য উন্মোচক হতে পারে।

অতএব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাস যদি লেখা হয় কোনো দিন, শুধু তাহলেই সেটা হবে পাকিস্তানের উদ্ভব ভেঙ্গে যাওয়া এবং বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ও সামগ্রিক তথা প্রকৃত ইতিহাস। আর আমাদের প্রজন্মকে সেই প্রকৃত ইতিহাস তুলে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। লেখক নিজে একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন সক্রিয়ভাবে।

এদেশীয় পাকতাবেদার ও দালালের সাথে তার সশস্ত্র সংঘাত হয়েছে। অতি নিকটে থেকে তিনি রাজাকার আল বদর ও শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের পর অনেক বন্দীর সাথে তার আলাপ হয়েছে সে অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত হয়েছে এ পর্যায়ের লেখাটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো বহু পূর্বে। বলা যায় ১৭৫৭ সালের লজ্জাজনক পলাশী যুদ্ধের ২৬৪ বছর আগে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে বাঙ্গালীরা সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তারপর বহু শতাব্দী পার হয়েছে। আমরা অতদুরে যাবো না, শুরু করবো সপ্তদশ শতাব্দি থেকে । আজকের যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তখন পৃথিবীতে আসেননি।

কিন্তু আমার ''সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'' গানটি একেশ্বরবাদী ব্রহ্মো ধর্মে অনুরক্ত বিশাল মাপের এক মহান কবি গানটি রচনা করেছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উজ্জবনী সঙ্গীত হিসেবে। গানটি রচনার ৬৮ বছর পর তিনি যে কারণে গানটি রচনা করেছিলেন তা ব্যার্থ হওয়ার পর, খন্ডিত পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। তার পরও গানটি একটি স্বাধীন জাতির জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহিত হয়েছে এবং বিগত পয়ত্রিশ বছর ধরে গীত হচ্ছে প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠানে । গানটি যে উদ্দেশ্যেই রচিনত হয়ে থাক, গানের বক্তব্য ভাষা যেন বর্তমান বাংলাদেশের কথাই বলে। গানের সুর বর্ণনা ও কাব্য বাঙ্গালীর অন্তরের কথাই বলে। সহিষ্ণু বাঙ্গালীরা তাই এই গানটিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই জাতীয় উদ্দীপনার সঙ্গীত হিসেবেই গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তান আন্দোলন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ

পৃথিবীর সকল মহান জাতি তাদের পূর্বসূরিদের দ্বারা অর্জিত যা কিছু মহৎ তা থেকে নিজেদের ভা□ারকে আরও সমৃদ্ধি করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য দিক নির্দেশনা পেয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে একটি জাতি যুগ যুগ ধরে ভুলভ্রান্তির পথ এড়িয়ে সঠিক পথে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বিশ্বের দরবারে একটি মহান জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা এমনই জাতি যারা সহজেই অতীতকে ভুলে যাই। আমাদের স্মৃতিশক্তি এতটাই দুর্বল যে আমরা মাত্র পঞ্চাশ বছরের আগের ইতিহাস মনে রাখতে পারি না। হয়তো ইচ্ছা করেই ভুলে যেতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যারা প্রচুর রক্তক্ষয় করে দু'দুবার স্বদেশ ভূমিকে শত্রু মুক্ত করেছে। একশত নব্বই বছরের শাসন শোষণের নিগড়মুক্ত হওয়া জন্যে ১৯৪৭ সালে বেনিয়া ইংরেজদের স্বীয় ভূমিথেকে বিতাড়িত করেছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ অগষ্ট, ইউনিয়ন জ্যাক পরিবর্তন করে চাঁদ তারা খচিত হেলালী ঝাঙা উত্তোলন করেছে। শুধু ধর্মকে পুঁজি করে ১৩ শত মাইল দুরের ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন নৃতাত্তিক গোষ্ঠির মানুষদের সাথে ঘর বসতি শুরু করে। দু'টি সম্পূর্ন পৃথক ভূ-খন্ডকে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে। অন্ধ আবেগ কবলিত হয়ে অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলো আমাদের পূর্বপুরুষরা। মাত্র তেইশ বছরের মধ্যেই আবেগ সম্বলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। পতাকার পরিবর্তন ঘটে । ভাষার প্রশ্নে মাত্র পাঁচ বছরে মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম লীগ ঃ

আগামী ৩০ ডিসেম্বর পূর্ণ হবে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ। আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেই ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতে মুসলিম রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল। সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে ওঠা কোন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না বা একক কোন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয়নি। উপমহাদেশে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের উন্থান ছিল অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে একাদিকে হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্যবাদ ও হিন্দু পুনঃজাগরণ এবং অপরদিকে মুসলমানদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকার কারণেই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ন্যায় মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়। আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় সর্বভারতীয় মুলমানরা তাদের মুক্তির নতুন সুর্য ওঠে। এখন এসবই ইতিহাস।

বর্তমান প্রজন্ম উপলব্ধিই করতে পারছে না কিরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা তাদের ন্যায্য দাবীর পক্ষে সারা ভারত চষে জনমত তৈরী করে পৃথক রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা স্বাধীনতার প্রশ্নে কেবলই ধারনা করি ১৯৫২ সাল, ১৯৬৬ সাল, ১৯৬৯ সাল এবং ১৯৭১ সাল। এই সময়

গুলোতে সংঘটিত বর্তমান প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এধারনাটি অংশিক সত্য, কারন ১৯৫২ সালের পূর্ব ও এর একটা প্রেক্ষপট ছিলো তৈরি হয়েছিলো। এই সালগুলোর পাশাপাশি আমাদের স্বরণ করতে হবে ১৯০৫ (বঙ্গাভঙ্গা), ১৯০৬ (সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন), ১৯৪০ সাল (লাহোর প্রস্তাব), ১৯৪৭ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। একশত বছরের ইতিহাস তেমন পুরাতন নয়।

ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান আন্দোলন, বৃটিশ ভারত ও হিন্দু সম্প্রসারণবাদীদের খপ্পর থেকে পাকিস্তান নামক মুসলমানদের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন এবং সব শেষে বিশ্বের মানচিত্রে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এসব গঠন এক সূত্রে গাঁথা। ১৯০৫ সালের বঙ্গাভঙ্গের প্রেক্ষাপটে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র এর জন্ম সঠিক ছিলো কি বেঠিক ছিলো সেটা আজ ইতিহাসের ছাত্রদের জন্যে প্রশ্ন বোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে একথা সঠিক প্রত্যেকটি ঘটনা ছিলো শোষিত জনতার শোষকের বিরুদ্ধে উত্থানে মাইল ফলক। চূড়ান্ত বিজয়ের পথে এক একটি ধাপ।

১৭৫৭ সালে দেশের শাসন মঞ্চে শাসকের পরিবর্তন হয়। মুসলিম রাজশক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের নবাবের মসনদ কেড়ে নেয়। আর একটি পরিবর্তন হয় রাতারাতি মুসলিম বাঙ্গালী ও হিন্দু বাঙ্গালী হিসাবে দুটো আলাদা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সনের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই সম্প্রদায় আর এক হয়নি। হিন্দুরা ছিলো শাসক ইংরেজদের কাছে অপেক্ষাকৃত পছন্দের সম্প্রদায়, অপরদিকে মুসলিম বাঙ্গালীরা ছিলো সবাসরি বিজিত শক্তি অর্থাৎ শত্রু। ফলে বৈষম্য বাড়তে থাকে।

হিন্দুরা জমিদার শ্রেণীতে পরিনত হয় মুসলিম বাঙ্গালীরা প্রজায় রূপান্তরীত হয়। শোষক শোষীতের এই দ্বারা অব্যাহত থাকে ১৯৪৭ পর্যন্ত । মাঝে হটাৎ একটু আলোর ঝলক ১৯০৬ সালের বঙ্গাভঙ্গের। বঙ্গাবঙ্গা আয়ু মাত্র ছয় বছরের। ১৮৫৬ সালে কলকাতা মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠিত হয় মুসলমানদের মনে এই বিশ্বাস জমি উপমহাদেশের মুসলমানদের তাদের অধিকার ও আশা-আকাক্ষার দাবীতে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করার জন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করা দরকার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এর অল্প কয়েক বছর পর ১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কলকাতায় মোহমেডান লিটারেটরী সোসাইটি গঠন করেন।

এই সোসাইটি সারা ভারত মুসলমানদের সংগঠিত করে মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন করে মুসলমানদের একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করতে নবাব আব্দুল লতিফ বড় রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এই এসোসিয়েশনের শাখা ছিল ৩৫ টি; যা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিল। এই সংগঠনের লক্ষ্যই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনগর্ঠন করা এবং সরকারের নিকট মুসলমানদের দাবীর স্বীকৃতি আদায় করা। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহমেডান এসোসিয়েশন ছিল প্রথম সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক জাগরণে প্রথম সংগঠন। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় এই সংগঠক অত্যন্ত অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাল গঙ্গাধর তিলক মুসলমানবিরোধী আন্দোলন শুরু করলে মুসলমান সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতে শুরু করে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবই ছিল তার আন্দোলনের মুল ভিত্তি। তিনি গোরক্ষা সোসাইটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৯২ সালে তিনি তার সংবাদপত্র 'কেশরীতে গোহত্যার বিরুদ্ধে একের

পর এক নিবন্ধ লিখেছিলেন। অবশেষে তিনি হিন্দসমাজের মাঝে একটি নূতন ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী গঠন করেন। তার এইসব কর্মকান্ডের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

ভারতে অসংখ্যবার হিন্দু মুসলমানদের মাঝে রক্তাক্ত দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তিনি শিবাজিকে (কুখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী অভিযানকারী) জাতীয় বীর হিসাবে তুলে ধরেন। বাল গঙ্গাধর তিলক তার সংবাদপত্র 'মারাঠাতে' লিখেন, 'বর্তমান প্রজন্ম তাদের বীরদের স্মরণ করুক এবং তাদের নিকট থেকে পথ চলার নির্দেশনা গ্রহণ করুক। এদিকে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দু জমিদার শ্রেণী মুসলিম প্রজাদের ওপর শোষণের সর্বপ্রকার প্রক্রিয়াই চলচ্ছিল। হিন্দু মহাজনদের ঋণের সুদ জোগাতে জোগাতে মুসলিম সম্প্রদায় রক্ত শূণ্য হয়ে মরণের প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়ায়।

এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া মুসলমানরা উগ্রবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছিল।

বলে গঙ্গাধর তিলকের মুসলিম বিদ্বেষী উগ্রবাদী আন্দোলন ছাড়াও উর্দু-হিন্দি বির্তকের বিষয়টিও মুসলমানদের অনুধাবন করাতে সক্ষম হয়েছিল যে তাদের একটি পৃথক রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নিবন্ধ ও চিঠিপত্র ছাপাতে শুরু করে মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণী। ক্রমবর্ধমান দাবীর সমর্থনে নবাব ইসমাইল খান, মহসিন-উল-মুলক, নবাব মেহেদী হাসান এবং সৈয়দ রাজা আলী পয়সা আকবার, দি আলিগড় ইন্সটিটিউট গেজেট ও পাইওনিয়ার পত্রিকাতে প্রচন্ড বেগবান প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সৈয়দ রাজা আলি এতদুর পর্যন্ত লেখেন যে মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দুরে থাকা উচিত হবে।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঃ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় সর্বভারতীয় মোহামেডান শিক্ষা সম্মেলনের পর নবাব ভিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে সর্বভারতীয় মুসলিগ লীগ আত্মপ্রকাশ করে। সূচনা হয় বৃটিশ ভারতে মুসলিম রাজনীতির এক নূতন অধ্যায়। মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে নবাব ভিকার- উল-মুলক বলেন, ''আমরা আজ এখানে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি তা নতুন কিছু নয়, যে মুহূর্তে কংগ্রেস গঠন হয় ঠিক সেই মহূর্তেই এর প্রয়োজন আমরা অনুধাবন করেছিলাম। সময়ের তালে তালে আমাদের অধিকার আদয়ের জন্য আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর এই জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়ে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে চলেছি; যা এতদিন হিমাগারে পড়েছিল।''

নবাব সলিমুল্লাহ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠনের ওপর প্রস্তাব পেশ করলে মৌলানা জাফর আলী খান হাকিম আজমল খান ও মৌলানা মুহাম্মদ আলী তা সমর্থন করেন।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরুপ ঃ

(১) বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমানদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং সরকারি বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে কোনরুপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে দেওয়া।
(২) ভারতীয় মুসলামনদের মনে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে দেওয়া।
(৩) উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো কোনমতেই ক্ষুন্ন না করে ভারতীয় অন্যান্য সম্পৃদায়ের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ লক্ষ্য করেছিল যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রতা সম্ভব, কিন্তু রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করা সম্ভব নয়।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্র সমুহের কথা ছিলো। বাংলা ও আসামের নিপিড়িত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ্য বাংলা ভাষাভাষি জনগণকে একটি রাষ্ট্র কাঠামোতে সংগঠিত করার প্রস্তাব ছিলো। পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগ নবাব ও ধনীক বেনিয়া মুসলিমদের দ্বারা নিয়ন্ত্রীত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী আমলা ও সেনাপতিরা এক সময় সম্পুর্ন দলটিকে গ্রাস করে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়। ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। এক সময় গণরোষ সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ফলশ্রুতি সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৪০ সনে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপত্তিত্ব করেছিলেন একে ফজলুলকে, তিনি সম্মেলনে শেষে বাঙ্গাল তথা শেরে বাঙ্গালা তথা শেরে বাঙ্গালা উপাধি পেয়েছিলেন।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাঠামো ঃ

লীগের নীতিনির্ধারকগণ লীগের সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা রেখেই ৪০০ সদস্য নিয়ে লীগ গঠন করেন। কেন্দ্রিয় কমিটিকে পরবর্তীতে কাউন্সিল নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। লীগের নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন একজন সভাপতি ছয়জন সহ-সভাপতি একজন সচিব ও দুজন যুগ্ম সচিব। কেন্দ্রিয় কমিটি বার্ষিক অধিবেশনের একজন সভাপতিকে নিয়োগ দিতে পারতেন। ১৯০৮ ও ১৯১৯ সালের মধ্যে দুজন স্থায়ী সভাপতি হিসাবে আগা খান ও রাজা মেহমুদাবাদ তাদের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৪ সালের পর লীগ প্রতিবছর সভাপতি নির্বাচন করতো। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের যুগ্ম হিসেবে মহসিন উল মুলক ও ভিকার উল মুলক তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল অবধি সাতজন সচিব (মেজর হাসান বিলগ্রামী, আজিজ মীর্জা, ওয়াজির হাসান, জহুর আহমদ সাইফুদ্দিন কিচলু, মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মালিক বরকত আলি) হিসেবে লীগের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৬ সালে নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সাল অবধি ঐ দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগকে

সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং শ্রীগ্রই সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লীগের শাখা অফিস তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পূর্ব বাংলায়ও ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ তার শাখা প্রতিষ্ঠা করে। মৌলভী রাজিউদ্দিন ও ঢাকার নবাব যথাক্রমে লীগের সভাপতি ও সচিব হিসাবে মনোনীত হন। তারপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

মুসলীম লীগের পথ ভ্রষ্টতা ও ব্যর্থতা ঃ

১৯৪০ সালের পর, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র । নবাব ও ধনিক শ্রেনীর কবলে পড়ে যায় মুসলিম লীগ। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার শ্রেণী বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান। ফলে বাংলা ভাগ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে 'সোনার বাংলা' গানটি লিখেছিলেন বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে, তা তার মৃত্যুর মাত্র অর্ধযুগ পরে স্থগিত হয়ে যায়। বাংলা ভাগ হয়েই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার চরিত্র সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে ফেলে। শোষীতের জন্যে কৃষক, শ্রমিক প্রজাদের সমর্থনে গঠিত দলটি, শোষকের দলে পরিণত হয় এবং এক সময় অনুজীবদের দলে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লেয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর কার্যত মুসলীমলীগ তার মুল আদর্শ ও চেতনা থেকে সরে যায়। ব্যর্থ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

শোষীত প্রজাদের সমর্থনে এবং আত্মত্যাগে অর্জিত পাকিস্তানে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম লীগ নেতারই পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। তারা প্রথম যে ভুলটি করেন তা হচ্ছে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা গঠিত পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালীদের মায়ের ভাষা বাংলাকে অস্বীকার। ভাষার দাবীতে আন্দোলনরত বাঙালীদের উপর নিক্ষিপ্ত প্রথম বুলেটই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি কাঠামো নড়বরে করে দেয়। পরবর্তী ২৩ বছরে সে কাঠামো মেরামত করা সম্ভব হয়নি বরঞ্চ পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে চাঁদপুর জেলার প্রেক্ষাপট ঃ

স্বাধীন মুসলিম শাসন অবসানের পর তিনটি অধ্যায়ে বাংলার গণ মানুষ পার করেছে দুইশত পঞ্চাশ বছর। (১৭৫৭-১৯৪৭) গোলামীর ১৯০ বছর, ব্রিটিশ শাসন আমল। (১৯৪৭-১৯৭১) প্রতরণার ২৪ বছর, পাকিস্তানি শাসন আমলে। (১৯৭১-২০০৫) স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪ বছর। ইতিহাস বর্ণনার জন্যে আমাদের একটু পিছন থেকে আসতে হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের কিছু অংশে মানুষের বসবাস ছিল। চতুর্থ বরফ যুগ শেষ হয়েছে পঁচিশ হাজার বছর আগে।

এ যুগে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা বরফের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকাসমূহে এসে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করে। এদের উত্তর পুরুষেরাই এদেশের গারো, হাজং কোচ, খাসিয়া, চাকমা, মোরং প্রভৃতি উপজাতি। এরাই হচ্ছে বাংলার আদি মানুষ। ত্রিপুরা ও পার্ব্বত ত্রিপুরা ভূখন্ডের জনবসতির বয়স কমপক্ষে আট হাজার বছরের বেশি প্রাচীন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা বর্তমানে কুমিল্লা জেলা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ। কুমিল্লার পূর্ব নাম কমলাংক কুমিল্লা জেলার অপর দুটো মহকুমার মধ্যে চাঁদপুর সব চাইতে নতুন জনপদ, এটি কমলাংক রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো না। বিষয়টি আমরা এই রচনার আগের কিছু অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। তবুও আবার উল্লেখ করলাম আলোচনার সুবিধার্থে।

মধ্যভারতের গাঙ্গেয় উপত্যাকা ও বাংলার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বিধৌত বিস্তৃত সমতলভূমি গড়ে উঠার বহু পূর্বেই সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, ময়মনসিংহের পাহাড়ী এলাকা, ভাওয়াল ও মধুপুরের পাহাড়ী এলাকা সমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিও ছিল বেশ পুরোনো এলাকা। চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী ও ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকাসমূহই বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো স্থলভূমি। এই পাহাড় এলাকগুলির সৃষ্টি হয়েছিল হিমালয় পবর্তমালা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই। হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছিল কোটি কোটি বৎসর পূর্বে এক বিরাট ভূ-বিপর্যয়ের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বর্তমানের হিমালয় পর্বতমালা ও তৎসান্নিহিত এক বিশাল অঞ্চল নিমজ্জিত ছিল সমুদ্রগর্ভে। বর্তমানের দক্ষিণ ভারতের বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী মাথা উচু করে দাড়িয়েছিল সেই মহাসমুদ্রে।

বর্তমানে ভারত মহাসাগরের বিরাট এলাকাজুড়ে ছিল এক বিশাল স্থলভূমি। কোন এক ভূ-বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্টি হলো হিমালয় পর্বতমালার, আর সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেল দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণের সেই বিশাল স্থলভূমি যার নাম এখন ভারত মহাসাগর। হিমালয়ের বিশাল পার্বত্য এলাকায় অনবরত বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট হচ্ছে স্রোত ধারা কোটি কোটি বৎসর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে নেমে আসছে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নদ নদীর । ফলে হিমালয় থেকে কোটি কোটি টন পলিমাটি নেমে আসছে প্রতি বছর নিম্ন এলাকায়। এমনিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের বিশাল পলল এলাকার এক কথায় পলল সমভূমির।

সর্বশেষে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের পলি মাটি অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলের বয়স সবচেয়ে কম। দেড় দুই হাজার বছেরের বেশি নয়। এই পলিমাটি অঞ্চল এখনো বেড়েই চলেছে। চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা এই নতুন সৃষ্ট ভূ-ভাগের অংশ। আগামী সহস্রাব্দে এই ভূ-ভাগ বেড়ে দ্বিগুন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের চাঁদপুর অঞ্চলের বর্তমান জনগোষ্ঠিই এই ভুমির আদি জনগোষ্ঠি। তাই ১৯৭১ সনে সংগঠিত যুদ্ধই আমাদের একক স্বাধীনতার যুদ্ধে।

একদা মধ্য ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছিল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের বাস। এদেশে আর্যদের আগমনের ধারা যতই প্রবল হতে থাকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পলিমাটি অঞ্চলের মানুষ ততই দক্ষিণ দিকে নূতন পলিমাটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরা পেশায় বেশির ভাগ মৎস্যজীবি। সমুদ্র ও নদী নির্ভর ছিলো এদের জীবন।

বাংলাদেশের পলিমাটি এলাকা গড়ে উঠার বহু পুর্বেই এদেশের পাহাড়ী এলাকায় গড়ে উঠেছিল মানুষের বসবাস। তাই এসব এলাকাতেই পাওয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংশাবশেষ। ময়নামতি, শালবন বিহার এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশী যুদ্ধের কয়েক বছর পর সমগ্র কুমিল্লা অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল নিয়ে ১৭৮১খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় রোসনাবাদ-ত্রিপুরা জেলা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় নোয়াখালী জেলা। বহুকাল ত্রিপুরা জেলায় কোন মহকুমা ছিল না। ১৮৬০ সনে গঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা আর চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৭৮ সনে। কুমিল্লা পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৬৪ সনে, ব্রাহ্মনবাড়িয়া পৌরসভা ১৮৬৮ সনে আর চাঁদপুর পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সনে।

দেশবিভাগের পর ত্রিপুরা জেলার নতুন নামকরণ হয় কমিল্লা জেলা। ১৯৮৪ সনে কুমিল্লা জেলাকে তিনটি জেলায় পরিণত করা হয় -ব্রহ্মণবাড়িয়া -চাঁদপুর-কুমিল্লা। অখন্ড কুমিল্লা জেলার জেলা পরিষদ - ''কুমিল্লা জেলার ইতিহাস" নামক একটি ঢাউস সাইজের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যেখানে তিনটি মহকুমার মধ্যে কুমিল্লাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদপুর অঞ্চলের বিশেষ কোন আলোচনা নেই, উল্লেখ করার মতো কোন তথ্য ও বইটিতে পাওয়া যায়নি। লেখক মনে করেন, চাঁদপুর জেলাকে নিয়ে গবেষণা কাজ চালানো উচিৎ তুলে ধরা প্রয়োজন এর সৃষ্টি অতীত ইতিহাস। নীলকরদের বিরুদ্ধে চাঁদপুর অঞ্চলে তীব্র আন্দোলন হয়েছে। সাহা মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে চাঁদপুর অঞ্চলে উল্লেখ করার মত প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলাপ করবো।

১৭৫৭ থেকে ২০০৫ সন পর্যন্ত চাঁদপুরের ইতিহাস

এই অধ্যায়ে আমরা ১৭৫৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা পূর্বেই বলেছি পলাশী যুদ্ধের দুযুগ পর অর্থ্যাৎ ১৭৮১ খ্রীঃ সালে সামধিক প্রয়োজনে ত্রিপুরা অর্থ্যাৎ বর্তমান কুমিল্লা জেলার সৃষ্টি হয়। তার ১২৭ বৎসর পর অর্থ্যাৎ ১৮৭৮ খ্রীঃ সনে চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। চাঁদপুর মহকুমা সৃষ্টির এক বৎসর পূর্বে ১৮৭৭ খ্রীঃ সালে ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি স্থাপন করেন রূপসার জমিদার আহমদ গাজী চৌধুরী।

জমিদার আহমেদ গাজী চৌধুরীর ঐকান্তিক চেষ্টায় চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাবুর হাটের কাছে স্থাপিত হয়েছিল এই অঞ্চলের প্রথম মঠ। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে আরো বহু মঠ নির্মিত হয় এবংএই গ্রামের নাম হয় মঠখোলা। বাবুর হাট তখনও স্থাপিত হয়নি। বাবুর হাটের পত্তন হয় আরো বহু বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে। রূপসার জমিদার আবিদ রাজা চৌধুরী কুমিল্লা জেলা পরিষদের একটানা পঁতিশ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। মুলতঃ রূপসা জমিদারদের চেষ্টায়ই চাঁদপুরের প্রশাসনিক দপ্তর সমুহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে শাহ আহমেদ চাঁদ (চাঁদ ফকির) এর নামানুসারে নতুন মহকুমার নামকরণ করা হয় চাঁদপুর।

চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানার লক্ষীনারায়ণ জিউর আখড়া স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তার পাঁচবছর পরে চাঁদপুর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৩সনে। ঐ সময়ের দু বছর পরে অর্থ্যাৎ ১৮৮৫ সনে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ নির্মিত হয়। পরে স্টিমার ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয় মেঘনার পাড়ে। ডাকাতিয়া নদীর বর্তমান শাখাটি তখন ছিলো না। কোট কাচারীর সুবিধার্থে কালী বাড়ী রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। বহুপরে পাকিস্তান আমলে ঐ নাম পরিবর্তন করে ঐ স্টেশনের নাম দেওয়া হয় চাঁদপুর কোর্ট স্টেশন।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে নির্মাণের অন্যতম ঠিকাদার ছিলেন শ্রী শিবনাথ ওয়াস্তী। ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি ছিল ত্রিপুরা রাজ পরিবারের কুলগুরু। এই ওয়াস্তী পরিবার রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনে প্রথমে পূর্ববঙ্গে এসে বসতি করেন হাজিগঞ্জে। পরে চাঁদপুর রেল স্টেশন নির্মাণের জন্য চাঁদপুর পুরান বাজারে নদীর পাড়ে নির্মাণ করেন নুতন বাড়ি। সেই সময়ে বর্তমান ডাকাতিয়া নদীটি ছিল, পানি নিষ্কাষণের একটি খনন করা খাল মাত্র।

মুল ডাকাতিয়া নদী ছিল মেঘনা নদী থেকে বেশ কিছু দুর দিয়ে প্রবাহিত। মেঘনার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৮৭২সনে ঐ খালটি কাটা হয়। চাঁদপুর রেল স্টেশন নির্মাণের জন্য ঐ খালের মুখে তিনটি বড় বড় পুকুর খনন করতে হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মেঘনার ভাঙ্গনে ঐ তিনটি দীঘি একাকার হয়ে নদীর স্রোতপ্রবল বেগে ঐ দিক দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে ডাকাতিয়ার বর্তমান ধারাটির সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে ওয়াস্তী বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তারা নতুন বাজারে নতুন বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। ওয়াস্তী পরিবারের অধ্বস্তন পুরুষ সাধুচরণ ওয়াস্তীর মৃত্যুর এক অর্থে পরিবারটির গৌরব আর থাকেনি। সাধুরচরণ ওয়াস্তী একজন অনৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

নীলকর বিরোধী সংগ্রামে চাঁদপুরের একটি গৌরবের ইতিহাস আছে। চাঁদপুরের নীল চাষীদের বিদ্রোহের গৌরব উজ্জ্বল কাহিনী অনেকেরই জানানেই। জি,পি ওয়াইজ সাহেব মেঘনা তীরবর্তী শ্রীমদ্দি, দুলালপুর,

ব্রাহ্মণচর, মছিমপুর, ভডংগাছচর এবং আকানগর নামক স্থানগুলিতে কুঠি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করেছিলেন। ১৮৬৬ সনে এই অঞ্চলে নীল চাষের পূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু নীল চাষীদের দুরন্ত প্রতিরোধের মুখে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দেই এই অঞ্চল থেকে নীল চাষ সম্পূর্ণ উঠে যায়। বেশির ভাগ নীল কুঠি এখন মেঘনাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেব বাজারে পর্তুগীজদের পরিত্যক্ত দুর্গে স্থাপিত হয়েছিলো একটি নীলকুঠি। এই নীল কুঠির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে অক্ষত অবস্থায় আছে কিছু স্থাপনা । ডাকাতিয়ার কুল ঘেষে শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী এলাকায় কিছুদিন পূর্বেও একটি নীলকুঠির দৃশ্যমান ভবন ছিলো। ২০০৪ সালে স্থানীয় জনগণ নীলকুঠির স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করেছে। চিতোষী উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের মধ্য অংশে নীল কুঠির একটি স্থাপনা ছিলো স্থানীয় জনগণ সেটিও ভেঙ্গে ফেলেছে।

১৮৭৮ সনে চাঁদপুর মহকুমা গঠনের পর চাঁদপুর শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন চাঁদপুরের বিখ্যাত উকিল দেশ নায়ক শ্রী হরদয়াল নাগ। তিনি ছিলেন গান্ধী বাদী অসাম্প্রদায়িক জননেতা। তার বাড়ির সামনে ঢাকার নবাবের বেগম সাহেবার আর্থিক সাহায্যে তিনি নির্মাণ করেন একটি মসজিদ। ঐ মসজিদের নাম হয় বেগম মসজিদ।

হরদয়াল নাগ ঐ মসজিদ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ঐ মসজিদ এবং হরদয়াল নাগের বাড়িটিই চাঁদপুর শহরের প্রথম পাকা বাড়ি। প্রায় সমসাময়িক কালেই মিজান চৌধুরী সাহেবদের বাড়িতেও একটি পাকা ঘর নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বেগম মসজিদের পুরাতন স্থাপনাটি ভেঙ্গে নতুন একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। হরদয়াল নাগের পুকুরটি ভরাট করে পৌর অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে চাঁদপুর শহরে তেমনকোন পাকা ঘর বাড়ি ছিলো না। ১৯২৮ সনে মাদ্রাসা হিসাবে স্থাপিত হয়ে ছিল চাদঁপুর নুরিয়া স্কুলটি এবং এটি ১৯৫৯ সনে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ঐ সময়েই চাঁদপুর গনি মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন কৈলাশ চন্দ্র ভৌমিক। ১৯১৭ সনে ঐ স্কুলটি হাইস্কুলে পরিনত হয়। আমজাদ আলী সাহেব চাদঁপুর পুরান বাজার এলাকায় স্থাপন করেন আমিন চেরিটেবল ডিসপেনসারী।

বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয় হয়েছে চাদঁপুর মিউনিসিপ্যাল চেরিটেবল ডিসপেনসারী। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান আমজাদ আলী সাহেব স্থাপন করেছিলেন তার তিন পুএ নুরুল হক, বজলুল গনি ও আমিনুল হকের নামে। তিনি চাদঁপুর হাসান আলী জুবিলী হাইস্কুলের আহমদিয়া হোস্টেল ও বেইলি হোস্টেল নির্মাণেও বিপুল আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। আহমদিয়া হোস্টেল বর্তমানে চাদঁপুর সরকরী মহিলা কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। চাদঁপুর পুরান বাজার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় তারই প্রদত্ত জমিতে। চাঁদপুর মহকুমা ও শহরের বিভিন্ন স্থাপনা সৃষ্টিতে মুসলিম জমিদারদের চেষ্টা ও দান ব্রিটিশ ভারতে উল্লেখ করার মতো। সমুদ্র গর্ভ থেকে উত্থানের পর এই জনপদ একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ হিসেবেই গড়ে ওঠেছিলো এবং এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

চাদঁপুরের শরৎচন্দ্র দে একজন সমাজ সেবী। ১৯১৩ সনে চাদঁপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ''চাদঁপুর অন্নকষ্ট নিবারণী সমিতি'' গঠন করে দুঃস্থ নরনারীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এই সেবা সংঘ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে অনেকেরই প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। এই সমিতির সেবায় কথা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

দেশসেবার ক্ষেত্রে চাদঁপুর আশীকাঠি নিবাসী গুরুচরণ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী সুশীলা মিত্রেরঅবদান স্মরণীয়। ১৮৯৩ সনে তার জন্ম হয়। তার বিয়ে হয় নোয়াখালির কুমুদিণী কান্ত মিত্রের সঙ্গে।

১৯৩২ সনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্রীমতি সুশীলা মিত্র প্রথম কারাবরন করেন। তিনি নোয়াখালির সরোজ নলিণী নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। এই সংস্থার শিশু মঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিভাগ ছিল। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে এবং ১৯৪৬ সনের দাঙ্গার সময় তিনি দুর্গত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ সনে কোলকাতায় গিয়ে এন্টালী এলাকায় তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুলেন। চাঁদপুরের হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বেশীর ভাগই ছিলেন কলিকাতা কেন্দ্রিক, ফলে ভারত পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারা কোলকাতায় স্থায়ী আবাস গড়েন। তাদের শূন্যস্থান গুলো পুরণ নতুন শাসক শ্রেণীভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়।

চাদঁপুরের বিখ্যাত উকিল বিমলচন্দ্র বসু একজন একনিষ্ঠ সমাজকর্মী ছিলেন।অকৃতদার বিমল বাবু তার জীবনের বিপুল উপার্জন বিভিন্ন প্রতিষ্টানে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় করে গেছেন। তিনি উইল মারফৎ তার সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ সমাজসেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রদান করে গেছেন। তিনি সর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অকুণ্ঠ সাহায্য প্রদান করতেন। একটি বিষয় অনুধাবন যোগ্য চাঁদপুর জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহু প্রাচীন ও গর্ব করার মতো। সকল রাজনৈতিক টানা পোড়েন এ চাঁদপুর জেলা ছিলো অচঞ্চল, স্থির এবং অবিচল।

রূপসার স্বনামধন্য জমিদার আহমদ গাজী চৌধুরীর রূপসা মসজিদ, আহমদিয়া হাই স্কুল, চাদঁপুর হাসান আলী হাইস্কুলের আহমদিয়া হেস্টেল, চাদঁপুর চৌধুরী মসজিদের জন্যে দান । সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তার নতুন সৃষ্ঠ মহকুমার বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করার মতো।

স্বামী স্বরূপানন্দের পিতার নাম শ্রী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। স্বামীজীর পূর্বনাম শ্রী বঙ্গিম চন্দ্র গঙ্গ্যোপাধ্যায়। তিনি কিশোর বয়সেই বিবেকানন্দের আদর্শ ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ মানব প্রেম তাঁকে অবহেলিত মানুষের আপনজনে পরিনত করেছে। তিনিই প্রথম তথাকথিত অচ্ছুত্রদের গায়ত্রী মন্ত্রের অধিকার দেন । সেই জন্যই স্বামীজীর আশ্রমের নাম অর্যাচক আশ্রম। এখানে কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য মৎস্য চাষ ও পশু পালনও ইত্যাদি প্রকল্প একের পর এক বাস্ত বায়িত হচ্ছে। তিনি একজন প্রথম শ্রেনীর লেখক ছিলেন।। তার প্রতিষ্ঠিত সাধনাদেবী সম্পাদিত প্রতিধ্বনি একখানি প্রথম শ্রেনীর মাসিক পত্রিকা। চাঁদপুর শহরের আদালত পাড়ায় তার আশ্রম রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট ধারার নাম '' অখন্ড পরিমন্ডল''

কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষাব্রতী

চাদঁপুরের সর্বপ্রচীন ইংরেজী শিক্ষ প্রতিষ্ঠান চালিতাতলী এডোয়ার্ড ইনস্টিটিউশন। এই স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮০ সনে। এই স্কুলে স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু উপেন্দ্র নাথ রায়।১৯৪৪ থেকে ১৯৭৪ পযর্ন্ত ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু সতীশ চন্দ্র ভৌমিক। এই স্কুল স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বাবু চাঁদ চন্দ্র দত্ত। এই স্কুলের পাঁচ বছর পর চাদঁপুর হাসান আলি হাইস্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮৫ সনে। এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু নবকান্ত মুখার্জী। ঐ স্কুলের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন বাবু সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তার অসাধারন পান্ডিত্য ছিল।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা পএ-পত্রিকায় আলী সাহেবের আর্থিক সাহায্যে। চাদঁপুর বাবুর হাট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৯ সনে। বাবুর হাট হাইস্কুল স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বাবু সারদা মোহন রায়। এই স্কুলের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু সারদা চরন দত্ত। তিনি ১৯০৭ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অবসর গ্রহলের পর তিনি এই স্কুলের পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি নিবাচির্ত হন। এই স্কুলের আর একজন নাম করা প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি জনাব ইদ্রিস মজুমদার।

কুমিল্লা প্রইমারী প্রশিক্ষন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯১০ সনে। এই স্কুলের বিখ্যাত হেড মাস্টার ছিলেন চাদঁপুরের সুরেন্দ্র লাল চৌধুরী। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা সার্ভে স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৪১ সনে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পযর্ন্ত ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু জানকীনাথ সরকার। মানুষ গড়ার সাধনা ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

১৯৪৭ সনে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার উভয়েই এই প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ভারত যুদ্ধের পরে পাকিস্তান সরকার ঐ স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে । কুমিল্লা বোর্ডও স্কুলটিকে এফিলিয়েশন দিতে অস্বীকার করেন। গৌরীপুরের মহারাজার দানকৃত বিপুল সম্পত্তি হতে প্রাপ্য লক্ষ্য লক্ষ টাকা হতেও এই প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে মহান ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানের চাদঁপুরস্থ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করে ১৯৬৯ সনে মাতৃপীঠ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হরদয়াল নাগের মৃত্যুর পর হতে ১৯৬১ সন পযন্ত ঐ স্কুলের পরিচালক ছিলেন সাধুচরন ওয়াস্তী। আমজাদ আলী পাটোয়ারী। স্থাপিত একই সময়ে তিনি গনি মাইনর স্কুল। ১৯৭১ সনে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ঐ স্কুলের একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান। ১৯২১ সনে তিনি গনি হাইস্কুলে যোগ দেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ঐ স্কুলে ৪৫ বছর শিক্ষকতা করেন। তিনি ২৫ বৎসরের বেশি সময় স্বীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হাজিগঞ্জ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সনে। প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টার ছিলেন রূপচন্দ্র সাহা। এর বহু পূর্বে থেকেই স্কুলটি মাইনর স্কুল রূপে চলে আসছিল। রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ পাশ করে মুদাফরগঞ্জের বিখ্যাত সমাজকর্মী সৈয়দ সাহাদাত হোসেন ১৯১৩ সনে ঐ মাইনর স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তিনি ৩৯ বছর শিক্ষকতা করেন এবং ৪০ বছর স্বীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বাজাণ্ডী রমণীমোহন উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯১৮ সনে। ঐ আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রায় ২৫ বছর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি গণি মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ছিলেন।

মতলবগঞ্জ জগবন্ধু সাহা বিশ্বনাথ ঘোষ হাইস্কুল স্থাপিত হয় ১৯১৭ সনে। ঐ স্কুলের স্বনামধন্য হেড মাস্টার ছিলেন জনাব ওয়ালী উল্লাহ্ পাটোয়ারী । তিনি ১৯৩১ থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি স্কুলের রেক্টর রূপে দায়িত্ব পালন করেন। স্কুলের প্রতিষ্ঠা থেকে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রসন্ন কুমার সাহা। ১৯১৭ সনে বোয়ালিয়া হাইস্কুলও স্থাপিত হয়। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টার ছিলেন ললিত মোহন সাহা।

১৯২১ সনে পুরান বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় হরিসভা মদুসূদনহাই স্কুল। স্কুলের উদ্যোক্তা বাবু মথুর পোদ্দার ও শ্রী জগদীশ আচার্যী। মথুর বাবুর গৃহ দেবতার নাম অনুসারে স্কুলের নামকরন করা হয় । স্কুলের প্রথম হেড মাস্টার ছিলেন মধুসূধন রায়। তিনি ১৯২১ সন থেকে ১৯৫০ সন পযন্ত ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলে। মধুসূদন রায় একাদিক্রমে ১৬ বছর চাদঁপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ছিলেন। রায় বাহাদুর মধুসূদন রায়ের নাম অনুসারে তার গ্রামের বাড়ির রেল স্টেশনের নাম হয় মধুরোড় স্টেশন।তার কন্যা যুথিকা রায় কোলকাতা বিজ্ঞান কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপিকা ছিলেন।

১৯৫০ সন থেকে ১৯৭৫ সন পযর্ন্ত মধুসূদন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু চিত্তররঞ্জন রায় চৌধুরি।১৯৩১ সনে তিনি স্বীয় গ্রামে বোয়ালিয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতাব্রত শুরু করেন এবং ঐ গ্রামে গড়ে তুলেন একটি বলিকা বিদ্যায়। তিনি ১৯৪৬ সনে চাদঁপুরে মধুসূদন হাইস্কুলে যোগদান করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। বিদ্যাবিতরণই ছিল তার জীবনের একমাএ সাধনা। ভোর ৬টা থেকে রাত্র ১১টা পযর্ন্ত দলে দলে ছেলে মেয়েরা এসে তার কাছে শিক্ষা লাভ করতো। এজন্য কারো কছে থেকে একটি পয়সাও তিনি গ্রহন করেননি। ১৯৮১ সনের ডিসেম্বরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চাদঁপুর দ্বারকানাথ হাইস্কুল স্থাপন করেন বাবু অন্নদা পাল তার স্বর্গীয় পিতার নামে। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হলেন শ্রী বিনোদ বিহারি দত্ত। তিনি ৩০ বছর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১৯২১ সনে মাতৃপীঠ মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী বাবু যোগেন্দ্রও সিংহ রায় মহাশয় প্রথমে এ স্কুলের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঐ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে চাদঁপুর মহিলা মহিলা সমিতি; যার অন্যতম নেএী ছিলেন শ্রীমতি পঙ্কজিনী সিংহ রায়।

বাকিলা হাইস্কুল ও বলখাল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সনে। প্রতিষ্ঠা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টার ছিলেন শ্রী রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধিরী। তিনি ৩০ বছর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় হাজিগঞ্চ ন্যাশনাল স্কুল। ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জুনাব আলী মজুমদার সাহেব। তিনি ১৯১৯ সনে গোল্ড মেডেল পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২১ সনে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আই এ পরীক্ষার্থী ছিলেন। ঐ সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্চন দাস কুমিল্লা এসে ছাএদের ইংরেজের স্কুল কলেজের গোলামী শিক্ষা বর্জনের আহাবান জানান। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জুনাব আলী সাহেব হাজিগঞ্জে এসে ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরদায়িত্ব গ্রহণ করে খাদি ও চরকা প্রচারে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৭ সনে কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়নে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বহুকাল স্বীয় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আজীবন জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেযুক্ত ছিলেন।

১৯৩৭ সনে চাদঁপুর লেডি প্রতিমা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চাদপুরের মহকুমা প্রশাসক মি.এম এটি আয়েঙ্গার আই সি এস এর উদ্যোগে ঐ স্কুলটি স্থাপিত হয়। তৎকালিন ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা স্যার বিএন মিত্রের সত্মী শ্রীমতী প্রতীমা মিত্র ঐ স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার নামানুসারে ঐ স্কুলের নামকরণ করা হয় লেডি প্রতিমা মিত্র উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি এখনো তার সুনাম রক্ষা করে চালু আছে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর ঃ

১৯৫২ সনের মাতৃভাষার জন্যে জীবন দান, ১৯৬২ সনের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৫ সনের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ দিন ব্যাপি পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ববঙ্গের জনগণের চোখ খুলে দেয়। ১৪০০ মাইল দুরবর্তী পৃথক ভাষা, সংস্কৃতির ধারক বাহক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধুই ধর্ম একটি রাষ্ট্রের বন্ধন হিসেবেসুদৃঢ় নয় এটা পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বুঝতে পারে।

১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে প্রথম যে স্মৃতির মিনার স্থাপিত হয় সে স্মৃতির মিনার স্থাপনের মূল নক্সাকার ডাঃ সাইদ হায়দারের অন্যতম সাথী ছিলেন এ জেলার এক সূর্যসন্তান ডাঃ আহমেদ ফজলুল মতিন। তিনি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আশির দশকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর থেকে কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ ভাষা আন্দোলনের অপর সৈনিক হচ্ছেন চাঁদপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডাঃ এম. এ. গফুর।

১৯৬৬ সনের শেখ মুজিবের ছয়দফা বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর প্রাণের দফায় পরিণত হয়। ১৯৬৯ সনে পূর্ববঙ্গের সমগ্র ছাত্র সমাজ ছয় দফাকে ভিত্তি করে আরো বিস্তারিতভাবে ১১ দফা প্রণয়ন করে। ছাত্র সম্প্রদায়ের এগার দফা পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়।

১৯৭০ সনে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানে বয়ে যায় সর্বকালের সবচাইতে প্রয়লংকারী ঘূর্নিঝড়। দক্ষিণ বঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এই প্রয়লংকারী ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা শাসকদের উদাসীনতা, ত্রাণকার্যে অনীহা, অপ্রতুল ত্রাণ সরবরাহ বাঙালীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বাঙালীরা তাদের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে, ১৯৪৭ সনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে শুরু করে।

ছয় দফা দাবীর প্রণেতা শেখ মুজীব পরিণত হন বাঙালী জাতির অবিসংবাদীত নেতায়। তারা তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে বাঙ্গালীরা শেখ মুজীবের আওয়ামী লীগকে পূর্ববঙ্গে দু'টি বাদে সকল আসনে নির্বাচিত করে। গণ ম্যানডেট পাওয়ার পর, শেখ মুজীব আরো বেশি দুর্বার হবে ওঠেন। পাহাড় সম জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন।

চাঁদপুর জেলার সবগুলো প্রাদোশিক আইন পরিষদসহ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সকল আসনে শেখ মুজীবের প্রার্থীকে চাঁদপুরবাসী জয় যুক্ত করে। স্বাধীকারের জন্যে জনগণ পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত হতে শুরু করে। এ ব্যাপারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চাঁদপুরের ছাত্র সমাজ দেশমুক্তির জন্যে ইস্পাত কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে সংগঠিত হতে শুরু করে।

১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের অপরিনামদর্শী সামরিক প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা বাঙালীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মূলতঃ সে ঘোষণাই পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সূত্রপাত হযে ওঠে। জননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রমনা রেইসকোর্স ময়দানে দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ প্রদান করেন। তার ভাষণ শোনার জন্যে বিশাল সংখ্যাধীক বাঙালী মাঠে সমবেত হয়েছিলো।

৮ মার্চ থেকে ছাত্র সমাজ বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে নগর বন্দরে সংগঠিত হতে শুরু করে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলো হয়ে ওঠে স্বাধীনতাকামী মুক্তি পাগল বাঙালীদের ঠিকানা। উচ্চারিত হতে তাকে ''তোমার আমার ঠিকানা পদ্মামেঘনা যমুনা'' পিন্ডি না ঢাকা – ঢাকা ঢাকা বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো''। জনতা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়, এখনই তারা স্বাধীনতার ঘোষণা চায়।

অলিপুর নামক চাঁদপুর জেলার সকল সংগ্রামে একটি ঐতিহাসিক গ্রামের ভূমিকা ঃ

সকল সময় শান্তি সংগ্রাম গ্রামটির কথা উল্লেখ করার মতো। এই গ্রামে (১৯২৭-৩২) পন্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহমেদের বিপ্লবী নেতৃত্বে স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত সংবদ্ধ কৃষক আন্দোলন হয়েছিলো। বলাখাল অঞ্চলের সুদ খেরে মহাজন কামিনি সাহা, মহাজন তথা জমিদারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো এই বিদ্রোহ। বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতিরোধ এক সময় সহিংসরূপ ধারন করে ছিলো।

হত ২৩ দরিদ্র, শোষিত মুসলিম কৃষক ও প্রজারা হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের যুগ যুগ ধরে জম হওয়া অবিচার ঘৃণা আর শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলো । আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৩১ সালে কৃষকদের হাতে প্রাণ হারিয়ে ছিলো কামিনি সাহা মহাজনের নায়েব আব্দুল আজিজ পাঠান। সুদখোর মহাজন কামিনি সাহার অত্যাচার থেকে জমি, জোত ও মা বোনের ইজ্জত বাঁচাতে অলিপুর ও পার্শ্ববতী গ্রামের জনগণ সংবদ্ধ হয়ে জমিদারের অত্যাচারী কর্মচারী আবদুল আজিজ পাঠানকে হত্যা করেছিলো। এ ঘটনার পর ব্রিটিশ রাজ শক্তি গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচারের তান্ডব লীলা বইযে দেয়, শত অত্যাচারের পরও গ্রামবাসীর একতা অটুট থাকে। চাঁদপুর জেলা শহরের পূর্ব দিকে হাজিগঞ্জ উপজেলার ছয়মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোনে প্রায় চারদিকে ডাকাতিয়া নদী বেষ্ঠিত এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামটির অবস্থান। চাঁদপুর জেলার সকল সংগ্রামে আন্দোলনে বিগত পাঁচশত বছর ধরে গ্রামটির রয়েছে অসামন্য অবদান।

জনশ্রুতি আছে পাঠান সম্রাট শেরশাহের শাসন আমলে কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধা যারা মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহর রাহে ঘর ছেড়ে ছিলেন তারা গ্রামটির পত্তন করেন। এই গ্রামে থেকেই আমাদের পূর্বসুরীরা অসীম সাহসে যুদ্ধ করেছেন পুর্তগীজ দস্যুদের সাথে। লড়েছেন মোগলদের সাথে ইংরেজ দখলদার রাজশক্তির বিরুদ্ধে, সর্বশেষ'৭১ সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁদপুর অঞ্চলের দুর্ধর্ষ পাঠান বাহিনীর জন্ম হয়েছে এ গ্রামে। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধেও এ গ্রামের সন্তান জহিরুল হক পাঠান বীরত্বের সাথে সম্মুখ সমরে লড়ে 'তমঘায়েই জরুরত' খেতাব পেয়েছেন।স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্যাঃ জহিরুল হক পাঠান সহ এ গ্রামের আরো ৩৫জন যোদ্ধা স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধে আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করছেন হাবিলদার রফিকুল ইসলাম।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান আর আলমগীরের সময়ে ডাকাতিয়া পাড়ে প্রকৃতির সৃষ্ট প্রতিরক্ষা যুহ্যের কারণে গ্রামটি চাঁদপুর অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠছিলো। বিখ্যাত মোগল শাসক মোঃ আব্দুল্লাহ এক সময় এই গ্রামে বসবাস করতেন। এখানে রয়েছে দুটো মোগল বাদশাহী মসজিদ। সৈন্যদের জন্যে ছিলো সেনা নিবাস, ঘোড় দৌড় মাঠ। রাজকর্মচারীদের জন্যে ছিলো পান্থ নিবাস। ঘোড় সাওয়ারসহ দু'শতাধীক সৈন্যের এক বাহিনী এখানে সব সময় মোতায়েন থাকত। বৃটিশ শাসন আমলে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ গ্রামের মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলো।

এই গ্রামেই এক সময় ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পন্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমেদের বিপ্লবী নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। সেটা ১৯২৮ থেকে ১৯৩১ এর ঘটনা। কৃষকরা সংগঠিত হয়ে ইংরেজ তথা

জমিদার কামিনি সাহা মহাজনের কুখ্যাত নায়েব আঃ আজিজ পাঠানকে হত্যা করেছিল। এই গ্রামেরই অপর সুর্য সন্তান কালজয়ী সামরিক প্রতিভা বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান। অলিপুর গ্রামটি অবস্থান গর্ত কারণেই সকল সময় বিপ্লবীদের চারণ ক্ষেত্র ছিলো।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই গ্রাম থেকে ৪জন যুবক ইন্ডিয়ান পায়ওনিয়ার কোরের সৈন্য হিসেবে মানবতার বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধে, প্রতিরোধ যোদ্ধা হয়েছিল। তারা আজ কেউ জীবিত নেই কিন্তু তাদের অমর কাহিনী আজো লোকগাঁথা হয়ে জীবন্ত যা রয়েছে মানুষের স্মৃতিতে। এরা হলেন সামশুল হক পাঠান, চিঠা গাজী, রেহানউদ্দিন, কালুগাজী। এই গ্রামের একজন সুসন্তান ছিলেন সিরাজ উদ্দিন মোক্তার, তিনি জমিদার বিরোধী আন্দোলনে গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে ছিলেন। পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করলে সিরাজ উদ্দীন চাঁদপুর মহকুমার রাজনীতির কেন্দ্র বিন্ধুতে পরিনত হয়। তিনি সমাজ হিতোষী কাজের জন্যে খান সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে এবং ব্রিটিশ শাসন আমলের শেষ দিকে তিনি সেনাবাহিনীর অনরারী রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এ গ্রামের সাত জন যুবক যোগ দিয়েছিল। এই সাতজনের মাঝে লেখকের পিতা মরহুম সামছুল আমিন সাহেবও ছিলেন। দেশের সীমানা ছেড়ে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিলেন মধ্য প্রাচ্যে। শ্রীলংকায় বাঙালী সৈনিকদের কিছু স্মৃতি চিহ্ন আছে সেখানেও এই গ্রামের সৈনিকদের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামের একজন লেঃ কর্ণেল এ. এফ. মতিন , একজন মেজর এ.এফ কবীর ও পাঁচজন জেসিও পাকসেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। যাদের মাঝে ক্যাঃ (অবঃ) জহিরুল হক পাঠানও ছিলেন, তখন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের আরো ১৯ জন সদস্য ছিলেন এই গ্রামের। এঁদের সবাই মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পাকসেনাবাহনীর সাথে চাঁদপুর অঞ্চলের সংগঠিত ৬৪টি যুদ্ধের প্রতিটিতে গ্রামটির কোনা কোন সদস্য সম্পৃক্ত ছিলেন।

একাত্তর সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ যখন পুর্ব বঙ্গ ছিলো সভা সমিতি মিটিং মিছিলে উত্তাল। তখন লেখক চট্টগ্রাম থেকে তার প্রিয় গ্রামে স্বজনদের কাছে ফিরে আসেন। গ্রামে এসে দেখতে পান দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তার মতো অনেকে ছাত্র-যুবক গ্রামে ফিরে এসেছেন। সকলের অভিষ্ট লক্ষ্য মুক্ত স্বদেশ। সাত মার্চের পর গ্রামে ফিরে আসা ছাত্র শ্রমিক, কৃষক ও সামরিক বাহিনীর বাঙালী সেনারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

অলিপুর ঐতিহাসিক দিঘীর পাড় যেখানে এক সময় মোগল সৈন্যরা কসরৎ করতো, নিত সামরিক প্রশিক্ষণ। যে দিঘীর পশ্চিম দক্ষিণ কোনে চির নিন্দ্রায় শায়িত আছেন নাম না জানা চারজন মোগল অথবা পাঠান সৈনিক। তাঁদের নাম জানা নাই তবে পুরাতন ইটে বাঁধানো সমাধি আজো অটুট, খানিক দুরে একটি পাঁচ গম্বুজ ও একটি তিন গম্বুজ মসজিদ বর্তমান।

এখানেই পাক শাসকদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলার বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। ১৮ই মার্চ অলিপুর দিঘীর পাড়ে জনা ত্রিশেক ছাত্র, শ্রমিক, চাষী, যুবক নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদলের গোলন্দাজ বাহিনীর নায়েব সুবেদার আব্দুস সাত্তার (হারেস ওস্তাদ) যিনি দু'টি ভোগরত ছিলেন, একটি মুক্তিফৌজ দল গঠন করেন। পরে ৭ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এককালিন জাতীয় বীর জহিরুল হক পাঠান এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এখানে রাত দিন চলতো কঠোর সামরিক

প্রশিক্ষণ। গ্রামটিতে অনেক অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞ লোক ছিলো, তারা সবাই এই সামরিক প্রশিক্ষণকালে তরুণদের উৎসাহ যোগাত।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই ক্ষুদ্র সেনা দলটিই চাঁদপুর মহাকুমার পরবর্তী দুর্ধষ পাঠান বাহিনীতে পরিণত হয়। সে মাসের শেষ সপ্তাহে যুদ্ধরত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ২নং সেক্টর এর মধুমতি কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। ২১ নভেম্বর যুদ্ধরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র বাহিনীরূপে গঠিত হলে মধুমতি কোম্পানী, ১২০৪ সাব সেক্টরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমা, নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ রায়পুর কুমিল্লার লাকসাম অঞ্চলে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এই সেনা সাব সেক্টরের মুক্তি সংগ্রামীরা। যাত্রা লগ্নে প্রথম গঠিত এই দলে যারা ছিলেন তারা হলেন ঃ-

১। অধিনায়ক সুবেদার জহিরুল হক পাঠান ২। সহ অধিনায়ক নায়েব সুবেদার আব্দুস সাত্তার (হারেস), ৩। সুবেদার আঃ গফুর, ৪। হাবিলদার আঃ হাফেজ মিয়া ৫। নায়েক মোস্তফা কামাল পাঠান ৬। সিপাহি শহিদউল্লাহ্ ৭। সিপাহি শহীদ উল্লাহ্ মীর ৮। সিপাহি আঃ রব ৯। সিপাহি আব্দুল মান্নান ১০। নৌ সেনা মোঃ রুহুল আমিন ১১। মোঃ দেলোয়ার হোসেন (বাবু) ১২। এ . এফ আজিম (মন্টু) , ১৩। মোঃ তরিকউল্লাহ্ ১৪। দিদারুল আলম পাটওয়ারী ১৫। মোঃ সফি উল্লাহ পাঠান ১৬। মোঃ বশির উল্লাহ পাঠান ১৭। মোঃ লোকমান পাঠান ১৮। মোঃ আবু মুন্সি ১৯। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিলু ২০। মোঃ সাইফুল ইসলাম মীর ২১। এ. এফ. রশিদ (মানিক), ২২। মফিজুল ইসলাম মিয়াজী ২৩। সাফাজ্জল হোসেন মীর ২৪। মোঃ আবুল বাসার ২৫। আঃ মতিন ২৬। শহিদ উল্লাহ্ ২৭। নজির আহামেদ ২৮। খলিলুর রহমান মিজি ২৯। খলিল সর্দার ৩০। হাসমত খান ৩১। আঃ রশিদ মীর ৩২। মহিব উল্লাহ্ ৩৩। মজিবুর রহমান ৩৪। মোঃ ইলিয়াস মুন্সি ৩৫। আলী আশ্রাফ। এরা সবাই যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সম্মুখ সমরে নিজেদের ব্যপৃত রেখেছেন।

প্রশিক্ষণের সময় ছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস সময়ে এই নিউক্লিয়াসের সৈন্যরা পাঠান বাহিনীর চালিকা শক্তি হিসেবে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে ছিলো।

এই বাহিনীর সস্যদের লড়া যুদ্ধ গুলোই চাঁদপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস এগুলো আপন মহিমায় ভাস্বর। চাঁদপুর জেলার নিম্নে বর্ণিত যুদ্ধগুলোর সাথে চাঁদপুর অঞ্চলের প্রথম সংগঠিত সেনা দলটির কোন -না- কোন সদস্য সম্পৃক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধগুলোর কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসে। প্রতি বছর ২১ শে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত সুভ্যেনিয়র এ শ্রদ্ধার সাথে এই যুদ্ধগুলোর কথা স্মরণ করা হয়।

ঘটনার চল্লিশ বছর পর ১৯৭১ সনে চাঁদপুর জেলার মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী ক্যাপ্টেন (অবঃ) জহিরুল হক পাঠান এই গ্রাম থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন। পাঠান সেনার নিউক্লিয়াস এখানেই গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন শসস্ত্রবাহিনী মধুমতি কম্পানী তথা ১২০৮ সাব সেক্টরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুক্তি সেনাদল যারা পরিচিত ছিলেন পাঠানবাহিনী নামে। পাঠান ফৌজ সর্বপ্রথম এই গ্রামেই সংগঠিত হয়েছিলো।

১৭ মার্চ ১৯৭১ আ. স. ম. আব্দর রবের নেতৃত্বে জয়বাংলা বাহিনী নামে স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক কায়দায় কুচ কাওয়াজ করে। ছাত্রলীগের বাম ঘেষা অংশ যারা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার বিশ্বাস করতো, তারা সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এর জাসদ ও গণবাহিনী নামে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গাণে ঝড় তুলেছিলো।

বাংলার হাজর বছরে শ্রেষ্ঠ সন্তান , প্রবাদ পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মুখে প্রতিবাদের ঝান্ডা নিয়ে এর দন্ডায়মান হয়েছিলো।

ফিরে আসি চাঁদপুরের কথায়, ১৮ মার্চ ১৯৭১ অলিপুর গ্রামে ছুটিভোগরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ সেনাদলের নায়েবসুবেদার (প্রয়াত) আঃ ছাত্তার এর নেতৃত্বে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির চালু হয়। সে সময় চাঁদপুর শহর সহ তৎকালীন থানা সদর সমুহেও জনগণ আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্যে সংবদ্ধ হতে শুরু করে। শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দুরে অলিপুর গ্রামের অবস্থান, সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ''স্পেশাল সার্ভিস'' গ্রুপের প্রশিক্ষক হাবিলদার আব্দুল গফুর (পরবর্তী সময়ে অনরারী ক্যাপ্টেন) ছিলেন এই সেনাদলটির অপর প্রশিক্ষক।

৪ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, (সেটি তখন যশোহর সেনা নিবাসে কর্মরত ছিলো) এর সুবেদার পাকিস্তানের জাতীয় বীর জহিরুল হক পাঠান (টিজ)নিজগ্রামের পাক দল ত্যাগী সেনা ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং ছাত্র শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সেনাদলের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এরাই এপ্রিল মাসের শেষ দিকে সচাঁদপুর মহকুমা শহর পাকসেনাবাহিনী কর্তৃক দখল হয়ে যাওয়ার পর ফরিদগঞ্জ থানার পাইক পাড়ায় গঠিত পাঠান বাহিনীর নিউক্লিয়াস রূপে আর্বিভূত হয়। ২৯/১২/৭১ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ১২০৪ সাবস্কেটারের চালিকা শক্তি ছিলো।

অলিপুরে গঠিত পাঠান বাহিনীর এই নিউক্লিয়াসটির সমসাময়িক সময়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে সতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিলো বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনী। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বিচ্ছিন্ন সকল প্রতিরোধ বাহিনীকে সমন্বিত করে একটি কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীনে আনা হয়। ২০.০৪.৭১ ফরিদগঞ্জ খাদ্য গুদাম লুট।

২৪-০৪-৭১ গাজীপুর যুদ্ধ রেল লাইনে প্রতিবন্ধক স্থাপন পাঠান বাহিনীর প্রথম সামরিক সংঘর্ষ । দালাল নিধন হানাদারদের দোসরদের ধরে এনে সংক্ষিপ্ত বিপ্লবী আদালতে ইত্যাদি কর্মকান্ড বিচার বাস্তবায়িত হতে থাকে।

লেখক ১৮ মার্চ'৭১ থেকে ১৭ জুন '৭১ পাঠান বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২৩ জুন ১৯৭১ উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২০ জনের একটি মুক্তিসেনাদল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন। এই দলে তার নিজ গ্রামের ছয়জন সহ পাশ্ববর্তী থানা ও গ্রাম সমুহের ছাত্ররা ছিলো। ২০ জনের মধ্যে ৪জন সামরিক নেতৃত্বের ওপর লিডারশীপ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে এফ.এফ. কমান্ডো লিডার হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সনের ১মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তার ঘোষণার পর মুহূর্ত হতেই পাকিস্তান নামক উদ্ভুত রাষ্ট্রটির কবর রচিত হয়ে যায়। ধর্মভিত্তিক সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্রটি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যেই অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের সমগ্র এলাকার মতো চাঁদপুরেও স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে অধ্যয়নরত ছাত্র সমাজ অন্যান্যদের সাথে প্রাথমিকভাবে চাঁদপুর মহকুমার প্রতিটি সংগ্রামী কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্যে একটি সদর দপ্তর স্থাপন করে ।

এই সদরদপ্তর তথা হেডকোয়ার্টার চাঁদপুর আনসার ক্লাব (বর্তমান উইমেন্স কলেজ হোস্টেল) এ স্থাপিত হয়।

পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক দখল হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এখান থেকেই সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ইতিমধ্যে প্রতিটি থানায় থানায় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যুবকদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাক সামরিকবাহিনীর হামলার কারণে বাংলাদেশ থেকে শত শত নরনারী সহায় সম্বল ঘরবাড়ী, ভিটেমাটি ফেলে প্রাণ বাচানোর জন্যে ভারত আশ্রয় নিতে শুরু করে।

ভারতের জনগণ সেই সংকটকালে বাঙালীদের মাতৃকোলে সন্তান আশ্রয় দেয়ার মত করে গ্রহণ করে। অন্যান্য জেলা শহরগুলি যেমনিভাবে এক এককরে পাক হায়নারদের হাতে চলে যায় এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে বিকালে চাঁদপুরকেও পাক সামরিক বাহিনী সেইভাবে জল ও স্থল অন্তরীক্ষে আক্রমণ করে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। চাঁদপুর শহর থেকে বিভিন্ন দলে মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র চলে যায়। স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সামরিক শিবির খোলা হলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুক্তিসেনাদের বিভিন্ন দল পুনরায় একত্রিত হতে শুরু করে। তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় চাঁদপুরে সশস্ত্র প্রতিরোধ পানা বাধে ।

তাদের কাছে চাঁদপুরবাসী জনগণকে বিপদে রেখে, দেশ ছেড়ে না পালিয়ে পালিয়ে বাড়ি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে প্রাক্তন সৈনিক , আনসার সংগ্রহ করে এক অবিস্মরণীয় প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলেন। এরা হলেন জনাব করিম পাটওয়ারী (তৎকালীন এমসিএ), এডভোকেট জনাব আবু জাফর মাঈন উদ্দিন (তৎকালীন এমসিএ), জনাব আলী আহম্মদ (হাজীগঞ্জ), জনাব আবুল খায়ের, জনাব সালে আহম্মদ বিএসসি, জনাব ইদ্রিস মোল্লা (ফিঙ্গারা), জনাব তোফাজ্জল হায়দার (নসু) চৌধুরী, জনাব ক্যাপ্টেন জহিরুল হক পাঠান (অবঃ), জনাব কলিম উল্যা ভূঁইয়া, জনাব জীবন কানাই চক্রবর্তী, ফ্লাই লেঃ (অবঃ) এ বি সিদ্দিক প্রমুখ।

প্রায় প্রতিটি গ্রামে গড়ে উঠে অনেক সংগ্রাম পরিষদ। সীমান্ত অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা ইপি আর সেনা, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার সদস্যবৃন্দের অস্ত্র সস্ত্র নিয়েই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জনগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলো। ঢাকা-চট্টগ্রাম -নারায়নগঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা নারী শিশু ও পুরুষদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এবং নগরগুলোতে পাকসেনাবাহিনীর অত্যাচারের কথা শুনে স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সারা দেশের মতো চাঁদপুরের গ্রাম গুলোতেও কোন প্রকার সমন্বয় ছাড়াই অসংখ্য প্রশিক্ষণ শিবির চালু হয়। সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর পালিয়ে আসা বাঙালী সদস্যরা এই সব কেন্দ্রে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। অস্ত্র-সস্ত্র গোলা বারুদ ছাড়ই এসময় প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ছাত্র শ্রমিক-কৃষক জনতা নেতাদের পেছনে ফেলে স্বাধীনতার জন্যে অগ্রবর্তী হয়ে যায়।

পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ ঘটনার নজীর খুব বেশি নেই। নেতারা জনতার ওপর সত্যিকার অর্থে নিয়ন্ত্রণ হারায়। ২৩ বছরের আশাভঙ্গের ইতিহাস হতাশা ও ঘৃনার পুঞ্জীবিতরূপ হিসেবে প্রকাশ পেতে শুরু করে। মেঘনা পদ্মা যমুনার পানির সাথে সিন্দু, ঝিলাম, ইরাবতির পানি আলাদা হয়ে যায়। বাঙালীরা পাকিস্তানের ওপর আস্থা হারায়। বাংলার হিন্দু মুসলীম বৌদ্ধ খৃষ্টান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্বাতিক গোষ্ঠি সমূহ এক হয়ে যায়। বাংলা আর বাঙালী জাতি সত্ত্বার প্রশ্নে সবাই একত্রিত হয়।

আসন্ন প্রচন্ড ঝড়ের আভাস বাংলার আকাশে বাতাসে মূর্ত হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষ ও বাতাসে বারুদের গন্ধ পেতে শুরু করে। দেশের প্রতিটি মানুষ তাদের নেতা শেখ মুজীবরের কাছে থেকে নির্দেশ পাওয়ার

জন্যে বাতাসে কান পেতে রাখে। অনেক নাটক আর কালক্ষেপনের পর ২৫ মার্চ পাক বাহিনী বাংলার ঘুমন্ত জনতার ওপর নৃসংস হামলা চালায়। ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ হামলার পর ক্ষণিকের জন্যে বাঙালী জাতি থমকে দাড়ায়। শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার কারণে তার অনুগামী জনতা হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্যে নেতৃত্ব খুঁজতে থাকে।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজীবুর রহমানকে গ্রেফতার করে মদ্যপ দুশ্চরিত্র ইয়াহিয়া খান ভেবেছিলো, সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু না, ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বাতাসে শোনা যায় এক বাঙালী তরুন মেজরের অসীম সাহসী আহ্বান। মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঝান্ডা সমুন্নত রেখে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বাঙালীরা বুঝতে পারে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সেনা নিবাস ও সশস্ত্র স্থাপনার বাঙালীরা অসম শক্তি বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

বর্বর পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সাথে যুদ্ধের পাশাপাশি বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রশিক্ষণ প্রাত্ত সেনা সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে কিশোর তরুন যুবাদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে শুরু করে। তাদেরে মধ্যে চাঁদপুর জেলায় নায়েব সুবেদার গফুর, সুবেদার ওহাব, হাবিলদার টি. কে মুহাম্মদ আলী, হাবিলদার আব্দুল মান্নান (মতিন), সিরাজুল ইসলাম, সুবেদার আব্দুল হক নায়েব সুবেদার আঃ ছাত্তার প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন সুবেদার জহিরুল হক পাঠান (বর্তমানে ক্যাপটেন অবঃ) এঁদের তত্ত্বাবধানে বৃহত্তর হাজিগঞ্জের অলিপুর, টোরাগড়, নরিংপুর বাজার, লোটরা বাজার, শোরসাগ বাজার, শ্রীপুর, ফরিদগঞ্জের পাইক পাড়া প্রভৃতি এলাকায় প্রশিক্ষণ শিবির পারিচালিত হয়।

পাঠান বাহিনীর অভ্যুদয় ঃ (প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ)

সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় উদ্যোগেই গড়ে ওঠে পাঠান বাহিনী। পাঠান বাহিনীর স্মৃতিকাগার ছিলো অলিপুর ঐতিহাসিক দিঘীর পাড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়। মুক্তিযুদ্ধের পর চাঁদপুর মহকুমার মুক্তিফৌজের কিংবদন্তীর নায়ক জহিরুল হক পাঠান এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্কুলের প্রবেশ মুখে বীরমুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠানের স্মৃতিরক্ষার্থে স্থানীয় জনসাধারণ একটি পাকা তোরণ নির্মাণ করেছে। এই তোরণের মাত্র ২৫ গজ দুরে রয়েছে অজানা চরে আওলিয়ার মাজার যাদের নামে গ্রামটির নাম হয়েছে অলিপুর। শোনা যায় এরাও বীর যোদ্ধা ছিলেন। হয়তো মোগল অথবা পাঠান সমাধিতে কোন শিলালিপি না থাকয় সনাক্ত করা যায়নি। অলিপুর গ্রামটি ডাকাতিয়া নদীর মোড়ে একটি ব দ্বীপকারের জনপদ, অবস্থানগত কারণে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপুর্ণ।

স্বাধীন বাংলাদেশের হাজার বছর পুর্বের ইতিহাসের সাথে চাঁদপুর জনপদের ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস ও একইরূপ। আমরা পুর্বে আলোচনা করেছি মুসলিম শাসনামলের বাংলাদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশের পুর্ব-পাকিস্তান হওয়ার পটভূমি নিয়ে। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়েও খানিকটা আলাপ আলোচনা হয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় সেসময় এবং পুর্ববতী দশকে চলছিল রাশিয়া, আমেরিকার স্নায়ু যুদ্ধ। সেসময় তৃতীয় শক্তি হিসেবে গণচীন উভয়ের কমন শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বৃটিশ উপনিবেশে থেকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে মানচিত্রে স্থান পাওয়া। তখন এ অঞ্চলে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য ভারত রাশিয়ার সাথে গাঁট ছড়া বাঁধে। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব এবং গণচীনের সাথে সৌর্হাদ্য গড়ে তোলে।

পাকিস্তানে চালু হয় সামরিক তন্ত্র আর ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র। অপর দিকে ১৯৭১ সালের দিকে আমাদের এ-ভূখন্ডে চীনা আর্দশের বাম রাজনীতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে ছিল। মোহাম্মদ তোয়হা, দেবেন শিক্ষকদার, আবদুল হক মতিন, আলাউদ্দিন, টিপু বিশ্বাস,সিরাজ শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসনের নিগড় হতে মুক্ত হয়ে চীন ধাঁচের একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন।

মধ্য ষাটের দশক হতেই পুর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য এরা সংগ্রাম করে আসছিলেন। ১৯৭০ সালের ৭ই নভেম্বরের নির্বাচনে প্রথাগত নির্বাচনমুখী আওয়ামীলীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। নির্বাচনে বিজয়ী হলেও পাকিস্তানী সামরিক প্রশাসন বাঙালি সংখ্যা গরিষ্ঠের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গণদাবী ও গণ ম্যানডেট উল্টে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। তারই ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ'৭১ পাকহানাদার বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করলো।

ফলশ্রুতিতে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য ভোটদানকারী জনগণ পুর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হয়। এই সময় আওয়ামী লীগের কাছে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র লড়াইয়ের সু-স্পষ্ট রূপরেখা না থাকায় অনেক নেতাকর্মী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যেহেতু বামপন্থিরা তাদের ভাষায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরোধী হওয়ার জন্য অনেকেই ভারতে যায় নাই। চাঁদপুরের ও অবস্থার ব্যতয় ঘটেনি। চাঁদপুরের অনেক

বীরমুক্তিযুদ্ধা কমিউনিটি পার্টির সদস্য ছিলেন। হাজিগঞ্জের কলিম উল্লাহ ভূইয়া তেমন একজন। তিনি পূর্ববঙ্গ কমিউনিটি পার্টির নেতা ছিলেন।

পাঠান বাহিনীর কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য যুদ্ধ ঃ

১। গাজীপুর যুদ্ধ ২৭/০৪/৭১ পাক বাহিনীর একটি সামরিক নৌযান ধ্বংস করা হয়। মুক্তি যোদ্ধাদের অধিকারে আসে প্রচুর অস্ত্রসস্ত্র। পাঠান বাহিনীর অস্ত্র ঘাটতি পুরনে বিরাট অবদান রাখে এই যুদ্ধ । ২। বলাখাল-রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাটের যুদ্ধ তারিখ ১৭/০৫/৭১। ৩। নরিংপুরের যুদ্ধ বৃহস্পতিবার ১৫/১৭/৭১। ৪। শাইসিয়ালীর যুদ্ধ ২১/০৭/৭১ । ৫। বাসারা যুদ্ধ (৫/০৮/৭১) এই যুদ্ধটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠানের। ৬। ওটতলীর যুদ্ধ (১০/০৮/৭১)।

অলিপুর গ্রামের দক্ষিণপূর্ব পার্শ্বে বহমান ডাকতিয়া নদীর তীরে একটি স্থান। নাম ওটতলী। তিন শত পঞ্চাশ বছর আগে এখানে সংগঠিত হয়েছিলো মোগল সেনাদের সাথে পুর্তগীজদের ভয়াবহ নৌ যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ের পর ফেরত মোঘল সৈন্যদের একটি উট নদীর প্রবল স্রোতের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। তাই স্থানটির নাম হয় ওঠতলী। তিনশত পঞ্চাশ বছর পরে ওটতলীতে সংগঠিত হলো আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ। যুদ্ধের তারিখ ঃ ১০/০৮/৭১। এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাঠান বাহিনীর সবাধিনায়ক জহিরুল হক পাঠান। পাঠান বাহিনীর আরো কিছু ঐতিহাসিক যুদ্ধ ।

১। বলাখাল হরিসভা এলাকার যুদ্ধ (১৭/০৮/৭১) ২। খিলাবাজারের যুদ্ধ (২১/০৮/৭১)
৩। হাসনা বাদের যুদ্ধ (২৮/০৮/৭১) , ৪। রূপসা বাজারের গঙ্গাজলী ব্রিজের লড়াই (৩১/০৮/৭১) ৫। সূচিপাড়া খেয়া ঘাটের যুদ্ধ (০৭/০৯৮/৭১), ৬। গাজীপুরের যুদ্ধ -২ (১৫/০৯/৭১) ৭। অফিস চিতশীর যুদ্ধ (২৯/০৯/৭১) ৮। গাজীপুরের যুদ্ধ - ৩ (১৮/১০/৭১)

চাঁদপুর জেলায় সংগঠিত ছোট বড় ৬৪টি যুদ্ধের বিবরণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এর মধ্যে ৬৩ টি ছোট এবং একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ। ০৫/০৮/৭১ তারিখে বাসারা বাজারের কাছে চাঁদপুর মহকুমা মুক্তি ফৌজের অধিনায়ক ক্যাঃ (অবঃ) জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে সফল এ যুদ্ধটিকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সকল সুখে গৌরবে আনন্দে অলিপুর গ্রাম স্বীয় জেলা চাঁদপুরের অন্তর জুড়ে থাকে। গ্রামটি হয়ে দাঁড়ায় চাঁদপুর বাসীর আশ্রয় স্থল।

একটি দুঃখজনক স্মৃতি ৯২ থেকে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা ২০০৫ এ এসে এবার হলো না। কারণ মুক্ত স্বদেশে আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কেউ নেই। - ক'দিন আগে আমি আমার গ্রামে গিয়েছিলাম ওখানে এখনও মুক্তিযুদ্ধের আলাপ হয়, সেখানে শাহজামালের মতো কোন সন্তানকে এখন মরতে হয়নি, তাই আমি গৌরবান্বিত। কারণ হিসেবে খুঁজে পেয়েছি একাত্তরে আমার গাঁয়ে একজনও রাজাকার ছিলো না। আমি সৌভাগ্যবান।

চাঁদপুর মহকুমা মুক্ত করে আমরা যেদিন ঘরে ফিরলাম। সে সময়টার কথা আজ বলতেই হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ ভাগে আমাদের মতো উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ পাওয়া এফ. এফ. কমান্ডোদের জড়ো করা হয়েছিলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২নং সেক্টার হেডকোয়াটার মেলাঘরে। ২১শে নভেম্বর '৭১ গঠন করা হয় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। ভারতীয় মিত্র

বাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এক যৌথ কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ শুরু করে। আমি ও আমার সাথীরা ভারতীয় বাহিনীর সাথে যুক্ত হই ২০ নভেম্বর '৭১।

পহেলা ডিসেম্বর'৭১ থেকে ৮ ডিসেম্বর'৭১ প্রচন্ড যুদ্ধের পর যৌথ বাহিনী উপনীত হয় হাজিগঞ্জ বাজারে উপকণ্ঠে হাজিগঞ্জ মুক্ত হওয়ার পর সেদিন রাতেই (দিবাগত রাত ১:০০টায় ০৮/১২/৭১) পাকবাহিনীর ৫৩তম বিগ্রেড এবং ১১৭ বিগ্রেডের পতন হয়।

একটু পেছনে তাকাই ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে পাক সেনাধক্ষ্য জেনারেল নিয়াজি নতুন করে চলমান যুদ্ধের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তিনি ভারতীয় সৈন্য মোতায়েনের প্রতি মনোযোগ দেন। তাকে সহযোগিতা করেন উপ-সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল রহিম খান। তিনি সম্ভাব্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসা যৌথ বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমনের পথ হিসেবে কুমিল্লার দক্ষিণ পার্শ্বকে চিহ্নিত করেন। সে সময় এই এলাকায় মুক্তিসেনাদের সাথে পাক চতুর্দশ ডিভিশন যুদ্ধরত ছিলো। এলাকাটি প্রস্থের দিক থেকে বেশ চওড়া। জেনারেল নিয়াজি এই এলাকাটির নাম দেন "নরম তলপেট"। এলাকাটির দায়িত্ব দেয়া হয় পাক সেনাবাহিনীর চৌকস সেনাধক্ষ্য মেজর জেনারেল রহিমকে। ৫৩ ও ১১৭ বিগ্রেড তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। জেনারেল রহিমকে পাকসেনাবাহিতে একজন সেরা এবং দক্ষ জেনারেল হিসেবে বিবেচনা করা হত।

জেনারেল রহিম কিছু অফিসার এবং অপারেশন মানচিত্র নিয়ে ২১ নভেম্বর রোববার যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি রণাঙ্গণে পৌঁছে তার সদর দফতর মুজাফফরগঞ্জ, চাঁদপুর সড়কে স্থাপন করেন (নিয়াজিব আত্মসমর্পনের দলিল, পৃ-১৭৪।) এদিকে কুমিল্লা ও ফেনীতে একটি করে পাক বিগ্রেড পুর্বেই ছিল। তখন চট্টগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন বিগ্রেডিয়ার আতাউল্লাহ। পাক সেনাবাহিনীর ৩৯ ডিভিশন চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। তাছাড়া সেখানে রাজাকার ও পুলিশসহ মিশ্রিত সৈনিক ছিল প্রায় ষোল হাজার। যদিও চট্টগ্রাম সমুদ্র থেকে অবতরণ ছাড়া অন্য কোন কারণে পাক সেনাদের জন্য ঝুঁকি মূলক ছিলনা।

পাক সমর নায়করা জানতেন পাকবাহিনীকে মূল লড়াই লড়তে হবে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বেলুনিয়ার উচ্চ ভূমিতে। অপরদিকে ভারতীয় ২৩তম পার্বত্য ডিভিশনের দুটো ব্যাটালিয়ান ১১বিহার ও ১৫ রাজপুত রেজিমেন্ট এবং বাংলাদেশের একটি এফ,এফ ব্যাটালিয়ান বিমানের সহায়তা নিয়ে ৪ডিসেম্বর আখাউড়ার কাছ দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। যুদ্ধরত অবস্থায় এফ. এফ. কোম্পানীটি মিত্র বাহিনীর সাথে মুদাফফরগঞ্জ, হাজিগঞ্জ হয়ে ৮/১২/৭১ দিবাগত রাত ৮টায় চাঁদপুর শহরের উপকণ্ঠে আশিকাটি এসে হাজির হয়। একটি ব্যাটালিয়ানের নেতৃত্ব দেন শিখ লেঃ কর্ণেল কে বি সিং অপর ব্যাটালিয়ানের নেতৃত্বে ছিলেন মহারাষ্ট্রের অধিবাসী লেঃ কর্ণেল আর পি শর্মা।

এফ এফ ব্যাটালিয়ানটিতে সংযুক্ত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেসিও সুবেদার বাগমারী ও সুবেদার গনপতস্বামী। চাঁদপুর জেলার এফ. এফ, কমান্ডো লিডার দেলোয়ার হোসেন বাবু (লেখক) এফ. এফ কমান্ডো লিডার এফ. এফ আজিম এফ. এফ কমান্ডো লিডার খান মোঃ বেলায়েত এফ. এফ কমান্ডো লিডার মুজিবুর রহমান এফ.এফ সুজন তালুকদার, এফ.এফ তরীক উল্লাহ পাঠান এফ.এফ আশ্রাফ প্রমুখ ছিলেন সতন্ত্র এফ. এফ. কম্পানীতে। এই অঞ্চলে অভ্যন্তর ভাগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীনস্থ মধুমতি কম্পানী অর্থাৎ পাঠান ফোর্স যুদ্ধরত ছিলো। বিকেল চারটা জহিরুল হক পাঠানের সাথে কে বি সিং এর যোগাযোগ হয়। পাঠান বাহিনীর সাথে পরামর্শক্রমে।

রাত ১:০০ টার সময় চাঁদপুর শহরে প্রবেশ করে মিত্র বাহিনীর এ দুটো ব্যাটালিয়ান। চাঁদপুর মুক্ত হওয়ার পর রাজধানী ঢাকা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে দাউদকান্দি হয়ে ঢাকায় উপস্থিত হয় মিত্র সেনাদের এ দু'টো ব্যাটালিয়ন। ১২ ডিসেম্বর ঢাকার উদ্দেশ্যে চাঁদপুর ছেড়ে যাওয়া এই সেনা দলটি পাক সেনাদের আত্ম সমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। আমরা আমাদের মুল বাহিনী পাঠান ফোর্সে যোগ দেই। পরবর্তী সময়ে ১৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা সেনা নিবাসে গঠিত হলে মার্চ'৭২ আমরা পড়াশুনায় ফিরে যাই। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা ছাত্র মুক্তিসেনারা পড়াশোনায় ফিরে যাই।

পাঠান বাহিনী তার গৌরবজনক লড়াইসমূহকে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সম্মানজনকভাবে একীভূত করে। ১৮ মার্চ ১৯৭১ যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ ৯টি মাস দেশের জন্যে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে পাঠান বাহিনী। অনেক দুর্গম পথ তারা অতিক্রম করে অবশেষে মঞ্জিলে পৌছেছে। কালের অমোঘ নিয়মেই একদিন পাঠান বাহিনীর বীর সদস্যরা পৃথিবী ছেড়ে যাবেন। কিন্তু পশ্চাতে থেকে যাবে এ বাহিনীর দুর্ধর্ষ সেনাদের অসম যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও জয়ের কাহিনী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

হানাদার পাক-সরমনায়কদের অমানুষিক অত্যাচার আর নীপিড়নের হাত থেকে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ও হামলা প্রতিরোধের সংগ্রামে যখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধ, তখন চাঁদপুরের জনগণও স্বাভাবিক কারনেই যুদ্ধে শামিল হলো। চাঁদপুরের অনেক গ্রামে ২৫ মার্চের অনেক পুর্বেই বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলি গোপনে গোপনে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিলো, ২৫ মার্চের নগ্ন হামলা সে মুহুর্তে প্রতিরোধ সংগ্রামে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে।

গোপনে গোপনে দেশীয় হাতিয়ার ও বোমা তৈরির এমন একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে বোমা তৈরির সময় বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁরা হলেন শহীদ আবুল কালাম, আব্দুল খালেক, সুশীল, শংকর উল্লেখযোগ্য। চাঁদপুর মিনার বালুর মাঠে পাশে তাদের স্মৃতির আজো চাঁদপুরের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর আহবানে যখন সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ চাঁদপুর মহকুমা যে গঠিত হয় পরিষদ সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা, কর্মীরা স্বাধীনতার যুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠে। তাদের উদ্যোগে চাঁদপুর নতুন বাজার বালির মাঠে কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ভাসানী ন্যাপের নেতা কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই সংগ্রামে সরাসরি জড়িত ছিলেন।

তাদের মধ্যে এই মুহুর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন, রবিউল আওয়াল কিরণ, আব্দুল মোমেন খান মাখন, আবু তাহের দুলাল, মনিরুল হক, আব্দুল আজিজ, ওয়াহিদুর রহমান, হানিফ পাটওয়ারী, মজিবুর রহমান, সৈয়দ আবেদ মনসুর, খসরু, জনাব আব্দুল মোমেন, আব্দুল লতিফ, গোলাম রাব্বানী, আবদুল খালেক, কাবিল আহমেদ, চন্দন পোদ্দার, প্রমুখ। তাদের সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও স্বক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। ছাত্রশ্রমিক জনতার নেতৃত্বে চাঁদপুরের বিভিন্ন অবস্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোগের দুর্গ গড়ে উঠে। ছাত্র নেতাগণ রাজনৈতিকভাবে দীক্ষিত ছিলেন, সক্রিয় এবং সচেতন ছিলেন কিন্তু একটি প্রশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বর্বর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা অথবা অস্ত্রসস্ত্র কোনটাই ছিলো না বাঙ্গালীদের।

২৫ মার্চের পর রাজনৈতিক নেতৃত্বে অনেকটা অনিশ্চিত ও অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রতিরোধ যুদ্ধ জমাট বাঁধতে সময় লাগে না। বিভিন্ন সেনা ছাউনী থেকে পালিয়ে আসা এবং

ছুটিতে থাকা সেনা পুলিশ ই,পি,আর আনসার বাহিনীর সদ্যরা তাদের করণীয় দায়িত্ব নিজেরাই কাঁদে তুলে নেয়। দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক শ্রেণী পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পক্ষত্যাগী স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাথে মিলে মিশে অচিরেই দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে।

জহিরুল হক পাঠান কে কেন্দ্র করে যে ছোট সেনাদলটি অলিপুরে মোগল দীঘির পাড়ে যাত্রা শুরু করে ছিল সেটি মে-জুনের মধ্যেই ১৫০০ জনের এক শক্তিশালী সেনাদলে পরিণত হয়। সমগ্র চাঁদপুর জেলা একটি সুশৃংখল সেনা নেতৃত্বের অধীনে আসে পরবর্তী সময়ে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সাব সেক্টরে পরিনত হয। পাঠান বাহিনী পরিচিত হয় বিখ্যাত মধুমতি কোম্পানী রূপে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে পরবর্তী অধ্যয়ে।

আবারো ফিরে আমি ছাত্র শ্রমিক জনতার কথায়। মার্চের সাত তারিখের পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জাতীয়তা বাদে বিশ্বাসী ছাত্রগণ সত্যিকার অর্থে দেশ শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। জনগণ এবং সরকারের বাঙ্গালী কর্মকর্তারা ও সেনা ছাউনী থেকে বেরিয়ে আসা সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সেনারা বিভিন্ন সরকারি গাড়িতে তৎকালীন পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা লাগিয়ে রাইফেল ও বিভিন্ন অস্ত্র সজ্জিত করে রাস্তায় রাস্তায় টহলের ব্যবস্থা করে।

ছাত্রদের তৎপরতা পাশাপাশি আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মুজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ ও বামপন্থিদলের নেতা কর্মীরাও বিভিন্ন থানায়, মহাকুমায় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন সুবেদার লুৎফর রহমানের (রামগঞ্জ) নেতৃত্বে চাঁদপুরের একটি রেগুলার বাহিনী গড়ে উঠে। তাঁর সাথীদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন, নায়েব সুবেদার নুর আহম্মদ গাজী (সুবেদার নুর আহম্মেদ গাজী পরে ১৯৭১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর চাঁদপুর থানার বাখরপুর মজুমদার বাড়িতে পাকবাহিনীর সাথে এক সম্মুখ লড়াইয়ে শাহাদৎ বরণ করেন। পরে সরকার তাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন)।

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী (নৌ-বাহিনী অফিসার), নায়েক এরশাদ উল্লাহ (মদন গাঁও, ফরিদগঞ্জ) সুবেদার মেজর করিম (করওয়াচর, ফরিদগঞ্জ), শাহ আতিকুর রহমান (বাচ্চু, বিমান সেনা দামুদরদী), এম,এ ওয়াদুদ (মতলব), সিপাহী করিম, নায়েক হেদায়েত উল্লাহ (উত্তর বালিয়া) প্রমুখ।

এই বাহিনী আনসার, পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক বাহিনী, পুলিশ বাহিনীর সমন্বয় গঠিত হয়েছিল। তাদের কর্মকান্ডের হেডকোয়াটার ছিল চাঁদপুরের আনসার ক্লাব। উল্লেখ করতে হয় ৪ এপ্রিল'৭১ চাঁদপুরের পাকবাহিনী প্রবেশের পর তারা পাকবাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। অনেকে পাকবাহিনীর সাথে লড়াই করে কেউ কেউ শহীদ হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের মুখে তারা টিকে থাকতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের কিছু অংশ পরে ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়ায় সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে গড়া চাঁদপুর সাব-সেক্টরের মূল বাহিনীতে যোগ দেয়। মে '৭১ এর প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানীর বিরুদ্ধে চাঁদপুর বাসীর প্রতিরোধ যুদ্ধ একক নেতৃত্বের অধীনে আসে এবং যুদ্ধ বেগবান হয়ে ওঠে।

মে মাসের প্রথম দিকে নরিংপুর বাজারের অবস্থান থেকে নোয়াখালীর চৌমুহনীতে অবস্থানরত পাক আর্মিদের সাথে ক্যাপ্টেন আবদুর রব চৌধুরীর নেতৃত্বে এক তুমুল লড়াই হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান, সুবেদার মেজর মফিজুল ইসলাম, সুবেদার মেজর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সুবেদার মেজর পন্ডিত আলী, নায়েব সুবেদার আবদুর রব, নায়েব সুবেদার করিম, নায়েব

সুবেদার, আরব আলী পাটওয়ারী, নায়েব আমিরুল ইসলাম (ইপিআর), হাবিলদার আবদুল মান্নান (গানার), ওমর ফারুক, হাবিলদার মোহাম্মদ আলী (টিকে), নায়েক আবদুল হালিম পাটওয়ারী, হাবিলদার গোলাম মাওলা, নায়েক শফিক, নায়েক জাহাঙ্গীর সহ আরো অনেকে। প্রচন্ড লড়াইয়ে হানাদার বাহিনী দারুনভাবে পুর্যদস্ত হয়। পাকহানাদার বাহিনীর অফিসারসহ ৪৭জন সৈনিক নিহত ও ৫৩ জনের মত আহত হয়। তখন পাকিস্তানের পক্ষে ফেনীর দায়িত্বে ছিলেন পাক কমান্ডিং অফিসার বিগ্রেডিয়ার আসলাম নিয়াজি। এরই মাঝে মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের পুর্ব দিকে লাকসাম অবস্থানে ছিলেন বিগ্রেডিয়ার ইকবাল শফি।

তিনি তার বাহিনীকে ডাকাতিয়া নদী অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎকালীন হেড কোয়ার্টার আক্রমনের নির্দেশ দেন। পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের কাছে মুক্তিবাহিনী আধুনিক অস্ত্র সশস্ত্র ছাড়াই শুধু মাত্র মানসিক শক্তির জোরে কিছু সময় টিকে থাকে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলে মুক্তি সেনারা অবস্থান পরিবর্তন করে। বেশির ভাগ যোদ্ধা সদ্য গঠিত পাঠান বাহিনীতে যোগ দেয়, অল্প সংখ্যক ভারতে চলে যায়। এই সেনাদের চাঁদপুর কম্পানীতে যোগ দেওয়ার ফলে পাঠানবাহিনীর শক্তি সাহস আশাতীতভাবে বেড়ে যায়।

তৎকালীন কুমিল্লা জেলার সমগ্র চাঁদপুর মহকুমা, কুমিল্লার লাকসাম থানা, বরুড়ায় এক অংশ লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, রায়পুর থানা একক বাহিনীর নেতৃত্বে আসে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে পাঠানবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশহিসেবে (মুক্তিফৌজ হিসেবে) তখন যুদ্ধ করেছিলো। এফ,এফ বাহিনী ও বি,এল,এফ বাহিনী তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখে যাচ্ছিল। পাঠান বাহিনী এই জেলায় ছোট বড় ৬৪টি যুদ্ধে হানাদার পাক বাহিনীকে মোকাবেলা করেছিলো। ৬৪টি সামরিক সংঘাতের মধ্যে ১টি সামরিক পরিভাষায় ও সংজ্ঞায় ছিলো পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ।

০৫/০৮/০১ তারিখের ফরিদগঞ্জ উপজেলার বাসারা বাজারের যুদ্ধটি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরি ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গযুদ্ধের মর্যদা পেয়েছে। যুদ্ধের একক নেতৃত্বে দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান। চাঁদপুর জেলার পর্ব দক্ষিণ প্রান্তে গড়ে উঠেছিল আর একটি প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি বিস্তৃত ছিলো তৎকালীন হাজিগঞ্জ থানার (বর্তমান শাহরাস্তি থানা) উগারিয়া বাজার, নোয়াপাড়া আপগ্রেড স্কুল মাঠ , বটতলা, প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ কাদবা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, হাসনাবাদ বাজার ও আলীনকীপুর হাইস্কুল মাঠ, রাঘৈ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ।

জেলার তৃতীয় প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে জেলার সর্ব দক্ষিণ থানা ডাকাতিয়া নদীর অপর পাড়ের গ্রহণ করেন ফরিদগঞ্জ থানার গৃদকান্দিয়া হাইস্কুল মাঠ, পাইকপাড়া হাই স্কুল মাঠ। কালির বাজার দক্ষিণ সাহেবগঞ্জ প্রাইমারী স্কুল মাঠ। মতলবেও বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে অনেকেই সহযোগিতা করেন তবে তাদের মধ্যে কলিমউল্লাহ ভুঁইয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য। এক সময় উগারিয়া চৌধুরী বাড়িতেও প্রশিক্ষণ এবং সংগ্রাম পরিষদের দফতর ছিল। পাঠান বাহিনীর পুর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দপ্তর ছিলো পানিয়ালা বাজারে।

পূর্বে বলা হয়েছে মার্চ ২৫ রাতে বর্বর পাকবাহিনী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ভয়াবহ হত্যাকান্ড শুরু করে বিভিন্ন শহরে নগরেও নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অফিস আদালত, স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ অসহায়ের মত সহায় সম্বল টাকা পয়সা হারিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রামে গঞ্জে ছুটে যায়। অসহায় মানুষ যখন ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য জেলে নৌকায় বা পায়ে হেঁটে চাঁদপুর শহর ও মহকুমার গ্রামে

গঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাদের সাহায্যে সংগ্রাম কমিটির লোকজন জেলার বিভিন্ন স্থানে লঙ্গারখানা খোলেন। যার যা ছিল টাকা পয়সা, চিড়ামুড়ি, ডাল চাল, গুড়, চা, চিনি, বিস্কুট, পানি ইত্যাদি নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। গ্রামের মানুষের এই ভালবাসার স্মৃতি চিরদিন মনে রাখার মতো। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে কথাটির সম্পূর্ণ রূপ সারা দেশে ফুটে ওঠে। অসহায় মানুষের দুর্দশার বিবরণ দেওয়া কোন কবি সাহিত্যিক অথবা ইতিহাসবিদদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই দুঃস্বপ্নের সময় চাঁদপুর জেলার কিছু বিবেকবান সাহাসী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন, সেই মানুষের কথা চাঁদপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে তারা সংগ্রাম পরিষদের নেতা হিসেবে অর্থ, খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অনেক সাহসী মানুষের ভীড়ের মধ্যে আব্দুল মান্নান বি.এস.সি, হাবিলদার রশিদ, আবদুর রব শেখ, আমিনুল হক মাষ্টার, জনাব হাফেজ আহম্মদ (তৎকালীন হাজিগঞ্জ মসজিদের ইমাম) সাইফুল ইসলাম, এ. এফ. রশীদ এর নাম উল্লেখ করতে হয়। একজন মসজিদের ইমাম হয়ে পাক বেঈমানদের সাথে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন নজির হয়ত খুব বেশি নেই হাফেজ মাওলানা হাফেজ আহম্মদ তেমনই একজন । সতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠন সমূহ পরবর্তী সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমা কমান্ডার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীতে সংযুক্ত হয়। যতই সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল জনতার সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছিল।

প্রকৃত অর্থে একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ বলতে যা বুঝায় সে হিসেবে লাঠিসোঠার সমাবেশ গুরুত্বহীন। তবে জাতীয় ঐক্য প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়, বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ তেমনি উদাহরণ দেওয়ার মতো একটি ঘটনা। ৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে নানা সময়ে পূর্ববঙ্গের ইস্যুতে আন্দোলনে সংগ্রামে মার্চ একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতা প্রস্তুতিবিহীন লড়াই জাতিকে অসহায়ের মত ঘাতক বাহিনীর উদ্যত বন্ধুকের নলের সম্মুখে ঠেলে দেয়। পাকসেনাবাহিনীর দল ত্যাগী বাঙ্গালী সৈনিকরা যদি সে সময় রুখে না দাঁড়াতো তাহলে কার্যকর প্রতিরোধ ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। স্বাধীনতার দাবী একদিন হয়তো অসফল লড়াই হিসেবে বিবেচিত হত।

অলিপুর ঐতিহাসিক দীঘির পাড়, পাইকপাড়া উঘারিয়া চৌধুরী বাড়িতে গড়ে ওঠা স্থানীয় বাহিনী সমুহ যুগের প্রয়োজনে বিস্ময়কর ভাবে একত্রিত হয়ে একটি সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো। পাঠানবাহিনীর শুভযাত্রা শুরু হয় চাঁদপুর অঞ্চলের ছাত্র শ্রমিক জনতা পাক পক্ষ ত্যাগকারী বাঙ্গালী সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী নৌ-বাহিনী তৎকালীন ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের সমন্বয়ে। অচিরেই এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়ে স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে আনার মানসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। এই বাহিনীতে প্রচুর দক্ষ সৈনিক থাকা সত্বেও প্রথমদিকে অস্ত্রের মধ্যে ছিল দু'চারটি শিকারী বন্দুক। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে, তাছাড়া তেমন কোন হাতিয়ার ছিল না।

মুরগির রক্ত গায়ে মেখে মামলা রুজু করার কৌশলে হাজিগঞ্জ থানায় গিয়ে বুদ্ধি বলে পুলিশদের ডিজআরম করে ৬টি রাইফেল, একটি পিস্তল,২৬৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলি সংগ্রহ করা হয়। বুদ্ধি দাতা ও অপারেশনের মূল হোতা কলিমউল্লাহ ভুইয়া। প্রায় একই সময়ে গেরিলা কায়দায় একজন পাকসেনাকে হত্যা করে তার কাছে থেকে প্রচুর গুলি ও একটি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ২৯ মার্চ হাজিগঞ্জ থানার রাজার গাঁও (দঃ) ইউনিয়নের শ্রীপুর পাটওয়ারী বাড়িতে কতিপয় দলত্যাগী ইপিআর সদস্য আশ্রয়নেন তারা কুমিল্লা সীমান্ত এলাকার বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় ২টি এল,এম.জি

কয়েকটি রাইফেল। এভাবেই পাঠান বাহিনীর অস্ত্র ভান্ডার সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। লেখক পাঠান বাহিনীর যাত্রা লগ্ন থেকে শেষ অবদি এই বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাই লেখার বর্ণনাগুলো তার স্মৃতি লব্দ।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সামরিক বিজয় ও অস্ত্র সংগহ ঃ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাঠান বাহিনীর সাথে সাথে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের তুয়া-হাই এলাকার 'কুয়েতখান' বাহিনীর একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে দেশের 'তুয়া-হাই' নামক স্থানে সংঘটিত একটি দুর্ধর্ষ লড়াই হয়েছিলো। একটি মাত্র কারবাইন দিয়ে শত্রুর একটি বিরাট ইউনিটিকে আত্মসমর্পণ করিয়ে হাতিয়ার সংগ্রহ ছিল সে অঞ্চলের ভিয়েতনামীদের জন্য একটি বিরাট বিজয়। ভিয়েতনামীরা এই কারবাইনকে জননী কারবাইন এবং এই যুদ্ধকে জননীযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই যুদ্ধের পরিচালক ও পরামর্শদাতা ছিলেন "কুয়েতথান" নামক ঢ্যাঙা,রোগাকৃত একজন কৃষক। পরবর্তীতে অসংখ্য যুদ্ধে সাফল্য দেখিয়ে তিনি একজন রেজিমেন্ট কমান্ডার হন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই চাঁদপুর জেলায় এই ধরণের জননী হাতিয়ার গাজীপুর এলাকায় লঞ্চ থেকে সংগৃহীত মেশিনগান ও বিপুল পরিমাণ গোলবারুদ। যা পাঠান ফোর্সের জন্য আর্শিবাদ বয়ে আনে। ২৭/০৪/৭১ গাজীপুর বাজারের কাছে পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষের পর পাক সেনাদের লঞ্চ লুট করে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহকে এলাকার প্রথম বিজয় বলা যায়। পাঠান ফোর্সের সর্বাধিনায়ক জহিরুল হক পাঠান আমাদের 'কুয়েত খান' গাজীপুর যুদ্ধকালীন সময়ে এক শক্ত সামর্থ কৃষক শাহজামাল যে লঞ্চ থেকে অস্ত্র নামিয়ে ছিলো অস্ত্র সংগ্রহকে পরবর্তী সময়ে সে পাঠান ফোর্সের এক সক্রিয় সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলো। জাতির দুর্ভাগ্য ২০০৫ সালের ১৫ অক্টোবর সামান্য মৎস্য শিকার নিয়ে বিরোধের সূত্র ধরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজামালকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বাজুতে শক্তি আর শক্তিধর হাতে রাইফেল থাকা অবস্থায় শাহজামাল ছিলো অজেয়। অস্ত্রসমর্পণ করার ৩৪ বছর পর বয়ঃ বৃদ্ধ শাহজামাল নির্মম ভাবে খুন হলেন গাজীপুর বাজারের সে স্থানে ২৭.০৪.৭১ পাক হানাদাদের সাথে যুদ্ধে মুক্তি সেনারা জয়ী হয়েছিলো সে স্থানে। যুবক শাহজামাল নিজ কাঁদে বয়ে এনেছিলেন পাকলঞ্চ থেকে উদ্ধার করা গোলা বারুদের বাক্স। দুর্ভাগ্য শাহজামালের নাকি তার রক্ত শ্রমে গড়ে ওঠা স্বাধীন দেশের প্রশাসনের যারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শরীক হননি। শাহজামালকে মৎসচোর আখ্যায়িত করে। নিজেদের কলংকিত করেছেন। যা হোক আমরা ফিরে আসি সে সময়ে পাঠান বাহিনীর পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা কতিপয় এই চারটি সংগঠনের আলোচনায়। (ক) বি,এল,এফ (খ) এফ, এফ (গ) নৌকমান্ড (ঘ) ভিত্তিফোজ।

বিএলএফ ও এফ এফ যোদ্ধাদের সাংগঠনিক পরিচয় ঃ

১৯৭১ সনে_দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকেরই নিয়মিত বাহিনীর মত সাময়িক প্রশিক্ষণ ছিল না। তারা প্রশিক্ষণের পর এম-এফ (মুক্তিফৌজ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাঙ্গালী সৈনিকগণ) বাহিনীর পাশাপাশি বীরত্বের সাথে স্বাধীনতার জন্য লড়েছে, তাদের অবদান অবিস্মরনীয়।

এই অধ্যায়ে আমরা তাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা স্মরণ করবো বাহিনী দু'টোর সাংগঠনিক বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। একটি রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সশস্ত্র গ্রুপ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিলো বিএলএফ। যুদ্ধ জয়ের চেয়ে অর্জিত সাফল্য নিজেদের পক্ষে সংহত করার, কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলো, এই বাহিনী ফলে বার হাজর সদস্যের এই বাহিনীর ঝুলিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই।

বি এল এফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) (রাজনৈতিক আর্দশে বিশ্বাসী বিশেষ সশস্ত্র দল)

বিগত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে চীন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সরাসরি জড়িত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ও সময়ে বিশ্বরাজনীতি হয়ে পড়ে বেশী অস্থিতিশীল।

রাশিয়া এবং গণচীনের রাজনৈতিক আদর্শগত পার্থক্য চরম আকার ধারণ করে। মাওবাদী আন্দোলনের নামে চীনা আদর্শিক রাজনীতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংশোধনবাদী সোভিয়েত রাশিয়া এবং সামাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিন্ন শত্রু রূপে গণচীনকে চিহ্নিত করে। নক্সালবাড়ি কেন্দ্রীক সাম্যবাদী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা সহ পূর্ব ভারতে বিস্ত ারলাভ করে। সে আন্দোলনের ঢেউ বাংলা দেশেও আছড়ে পড়তে শুরু করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সে স্রোতে বাধ সাধে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগ ২টি বাদে সকল আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামীলীগ ছয়দফা দাবীর অনুকূলে গণ্যম্যানডেট লাভ করে। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই পাকিস্তানের পূর্ব অংশের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন। বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত দলগুলো এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাহীন ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করে।

পাকিস্তানীদের অহংবোধ আর স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের ভুল সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চের দুঃখজনক ঘটনার জন্ম হয়। সেনাবাহিনী ত্যাগী বাঙ্গালী সেনাসদস্যের সাথে দেশের অভ্যন্তরেই পাক-হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। তাছাড়া রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সবাই জানেন পূর্ববাংলার স্বাধীনতার

জন্য বামপন্থি দলগুলি গোপন সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন অনেক পূর্বেই গঠন করেছিলো। মোটামুটিভাবে দেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন স্বাধীনতার জন্যে সংগঠিত হতে থাকে।

পাকিস্তানী সেনা ঘাটি ছাড়া দেশের বাকী অংশ মুক্তাঞ্চল হিসেবে বিস্তৃত হতে থাকে। গেরিলাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) আক্রমণে পাক-হানাদাররা অনেকটা কোনঠাশা হয়ে পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী রাজনৈতিক কর্মী জনগণমুক্তিফৌজ ও বামপন্থী সশস্ত্র যোদ্ধারা ব্যাপকভাবে জনগণের সমর্থন পেতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি বাম প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি অবলোকন করে। ভারত প্রবাসী সরকার চিন্তায় পড়ে যায়। নতুন করে শুরু হয় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। তারা ভাবল যদি বামপন্থীরা আরো এগিয়ে যায় তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ হবে অন্যরকম। '৭১ সনের সম্ভাবত মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত মন্ত্রী মার্শাল উস্তিনভ ২৩ দিনের জন্য ভারত সফরে আসেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে একটি দলীয় আদর্শ ভিত্তিক বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিকল্পনাটি সমর্থন করে। নব সৃষ্ট সশস্ত্র দলটির নাম দেওয়া হয় "বিএলএফ"। বেঙ্গল লিভারেশন ফোর্স।

পরবর্তী সময়ে তারা মুজিব বাহিনী নামে খ্যাতি লাভ করে। (বাস্তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পরামর্শ বা আদর্শ বাদ দিয়েই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র" (Research analytical wing) এর পরিচালক মেজর জেনারেল এস.এস. ওভানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাহিনীটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাথে এই বাহিনীর কোন সমন্বয় বা যোগাযোগ ছিল না। এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক। ছাত্রলীগ যুবলীগ ও শ্রমিকলীগের রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষা প্রাপ্ত বাছাইকৃত যুবকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো এই বাহিনী। দেশের ব্যাপক যুদ্ধে এর খুব বেশি ব্যপৃত হয়নি। এর ছিলো রাজনৈতিক ক্যাডার। পরবর্তী সময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর এরা জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পূর্বাঞ্চলের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো আসামের হাফলং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। পশ্চিমাঞ্চলের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো দেরাদুনের 'টাড়ুয়া' নামক প্রশিক্ষণ শিবিরে। এতেও অবস্থা অনুকূলে না আসার কারণে সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন শ্রেণী মত থেকে আসা তরুনদের দ্বারা গঠিত এফ.এফ. বাহিনীর কমান্ড ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের কর্মীদের দ্বারা গঠিত বি.এল.এফবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনার অভিপ্রায়ে ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে স্থাপিত লেম্বুচড়া সামরিক (Jungle war school) স্কুলে এফ.এফ এর বাছাই করা গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের ৩৬ দিনের নিবিড় সামরিক (Leadership) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এরা Leadership, command , Political Motivation, (Airfield Preparation Map Reading, Communication, demolation এর ওপর উচচতর প্রশিক্ষণ পায়। যদি যুদ্ধ প্রলম্বিত হতো তাহলে এই FF commandoo Leader রা ভবিষ্যৎ গণমুক্তিফৌজের Back Bone হতেন। এবং এরা BLF এর সাথে একীভূত হয়ে যেত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তখন অন্যরকম হতো। মাওসেতুং, চেগুয়েভরা, কিদেল কাস্ট্রোর মতো ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসতো এই মুক্তিসেনাদের মধ্য থেকে।

তৎকালীন চাঁদপুর মুহকুমা বিএল এফ এর সাংগঠনিক রূপরেখা ঃ

চাঁদপুর মহকুমা বিএলএফ কমান্ডার রবিউল আওয়াল কিরণ, সহকারী মহকুমা কমান্ডার – আব্দুল মোমেন খান, চাঁদপুর থানা বিএলএফ কমান্ডার– সৈয়দ আবেদ মনসুর, হাজিগঞ্জ থানা বিএলএফ কমান্ডার –হাতেম আলী, হাজিগঞ্জ থানা সহকারী কমান্ডার– ফয়েজ মুন্সী, ফরিদগঞ্জ থানা কমান্ডার– হানিফ পাটওয়ারী, কচুয়া থানা বিএলএফ কমান্ডার– ওয়াহিদুর রহমান, মতলব থানা কমান্ডার– জহিরউদ্দিন বাবর, সহকারী থানা কমান্ডার মতলব–আবুল খালেক মাষ্টার। যুদ্ধাহত এম. এ. ওয়াদুদ বি.এল.ফের অন্যতম কমান্ডার ছিলেন। ডিসেম্বর'৭১ বার হাজার সদস্যের এই বাহিনীটর সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় বায়ান্ন হাজার।

নৌ– কমান্ড দল ঃ

নৌ–কমান্ডোরা চাঁদপুর মহকুমার অপর মুক্তিসেনাদল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যে সকল তরুন অংশগ্রহণ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। নৌ– কমান্ডো মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী তাদের মধ্যে অন্যতম। চাঁদপুর থানাধীন মহষদি গ্রামের মোঃ মেহের উল্যাহ পাটওয়ারী দ্বিতীয় পুত্র মোঃ মমিন উল্যা পাটওয়ারী ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। মমিন নৌ কমান্ডো দলের লিডার ছিলেন। ১ আগস্ট ১৯৭১ দিবাগত রাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকে সমুদ্র ও নদী বন্দরে যে সর্বাত্মক নৌ–কমান্ডো হামলা চালানো হয়। চাঁদপুর ও তার বাইরে ছিলো না। চাঁদপুর লন্ড ঘাটে পাকসেনাদের ৩টি জাহাজ মমিন উল্লাহ্ পাটওয়ারী, সাহাজান কবির, আব্দুল হাকিমের দল ডাকাতিয়া নদীতে ডুবিয়ে দেয়।

এফ এফ (গণমুক্তিফৌজ)

এফএফ অর্থ ফ্রিডম ফাইটার। মুলতঃ এই বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনীর মত পূর্ব প্রশিক্ষণ ছিল না। দেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক শ্রেণীর সদস্যদের তরুন সাহসী স্বাধীনতা কামী সদস্যদের মধ্য থেকে এফ. এফ. বাহিনী গড়ে ওঠে। এই বাহিনীর সদস্যগণ যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং দেশের ভেতর যুদ্ধরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গড়ে তোলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধে এফ.এফ. বাহিনীর অবদান যে কোনে দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী গণমুক্তিফৌজের সাথে তুলনীয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই বাহিনীর আত্মত্যাগ সবচাইতে বেশি। এই বাহিনীকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হয়। একটি গ্রুপ সেনাবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তারা রেগুলার বাহিনীর মত নির্দিষ্ট হারে ভাতা পেত। অন্য গ্রুপ যারা এফ এফ সেকশান, প্লাটন ও এফএফ কোম্পানীতে বিভক্ত ছিল দেশের অভ্যন্ত র ভাগে যুদ্ধ করতো। তারা নিয়মিত ভাতা পেত না। তবে বিভিন্ন সময়ে পকেট মানি হিসেবে কিছু পেত। এফ এফ বাহিনী সরাসরি কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানির নির্দেশে পরিচালিত হতো। বাংলাদেশের এগারটি সেক্টরের এগারজন কমান্ডারের অধীনে নব্বই হাজার এফ.এফ. সদস্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে।

নিম্নে ১৯৭১ সালে গঠিত বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা এফ এফ বাহিনীর সাংগনিক রূপরেখা দেওয়া হল ঃ

কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার খালেকুজ্জমান ভূইয়া (রূপসা, ফরিদগঞ্জ, বর্তমানে বাসদ সভাপতি), চাঁদপুর থানা কামান্ডার শাহ মহিউদ্দিন দুলু পরে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী)। মতলব থানা কমান্ডার কবির আহমেদ খান (বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় সংসদের চেয়ারম্যান) ফরিদগঞ্জ থানা কমান্ডার বেলায়েত হোসেন খান, হাজিগঞ্জ থানা কমান্ডার জনাব মজিুবর রহমান মজুমদার (বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) কচুয়া থানার কমান্ডার আবদুর রশিদ পাঠান (বর্তমান পেশা, ব্যবসা)।

সতন্ত্র এফ এফ কোম্পানী

এফ. এফ বাহিনীর সবচাইতে সাহসী চৌকস সদস্যদের নিয়ে এফ.এফ. সতন্ত্র কম্পানী গঠিত হয়। এরা সেনাবাহিনীর সাথে থেকে সম্মুখসমরে অংশ গ্রহণ করেছিলো। এফ এফ সতন্ত্র কম্পানীর একটি দল ৩০ নভেম্বর'৭১ ২৩তম ভারতীয় পার্বত্য ডিভিশনের সেনাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধরত অবস্থায় ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ দিবাগত রাত ১-৩০ মিঃ চাঁদপুর মহকুমা শহরে প্রবেশ করে। এই বাহিনীর কয়েক জন খ্যাতনামা বীর মুক্তিযোদ্ধা।

(ক) দেলোয়ার হোসেন (বাবু) এফ এফ কমান্ডো লিডার (লেখক)। (খ) মজিবুর রহমান এফ এফ কমন্ডো লিডার (আমেরিকা প্রবাসী)। (গ) এ. এফ আজম (মন্টু) এফ.এফ কমান্ডো লিডার (প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ঢাকা) (ঘ) সুজন তালুকদার এফ.এফ সদস্য (আমেরিকা প্রবাসী) (ঙ) অচিন্ত্য দেবনাথ এফ.এফ সদস্য (ভারত প্রবাসী) (চ) তরিক উল্লাহ পাঠান এফ.এফ সদস্য (ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী) যুদ্ধকালীন সময়ে এরা সবাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান। বর্তমানে সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এফ.এফ. বাহিনীর অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা ইতিমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করছে।

আবার ফিরে আসি চাঁদপুর মহকুমা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের কথায়। পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির মুক্তিসেনারা চৌমুহনী ধরে রাখতে পারেনি। শত্রুর প্রচুর ক্ষতি সাধন করে তাঁদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী পিছনে ফিরে এসে পুনরায় ইকবাল শফি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাঁর বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে চরম মার খেয়ে পিছনে চলে এসে চিতশী বাজারে অবস্থান নেয়।

চিতশী বাজারে অবস্থান নিয়েই চিতশী বাজারে এবং তার আশেপাশে অগ্নিসংযোগ করে। টেলিকম্যুনিকেশনসহ বিভিন্ন স্থাপনা বসিয়ে তাদের অবস্থানকে মজবুত করে। মুক্তিযোদ্ধারা নরিংপুর থেকে তাদের ক্যাম্প রামগঞ্জ থানার পানিওলা গ্রামের ঠাকুর বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে। প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল সমস্যা ছিল দূর পাল্লার হাতিয়ার ও গোলাবারুদ। সুবেদার মেজর লুৎফর রহমানের দল ছিল খুবই চৌকস তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে পাঠান বাহিনীর সাথে যোগ দেয়।

চলমান জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কে চাঁদপুর জেলায় শুরু থেকে যারা সংগঠিত ও বেগবান করেছিলেন তারা হলেন, আমাদের গৌরব চাঁদপুরের সূর্য সন্তান মিজানুর রহমান চৌধুরী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি), আব্দুল করিম পাটওয়ারী (তৎকালিন এমসিএ), এডভোকেট জনাব আবুজাফর মাঈন উদ্দিন (তৎকালিন এমসিএ), এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম (তৎকালিন এমসিএ), ডাঃ আব্দুস ছাত্তার (তৎকালিন এমসিএ), কমরেড জনাব কলিমউল্লা ভূইয়া, নসু চৌধুরী, জনাব আব্দুল মান্নান বিএসসি, ফ্লাইট লেঃ এ বি সিদ্দিক সরকার, জনাব আব্দুর রব, জনাব নৌজোয়ান ওয়ালী উল্লাহ (তৎকালিন এমএনএ), রাজা মিঞা (তৎকালিন এমসিএ), জীবন কানাই চক্রবর্তী, এডভোকেট এম এ আওয়াল (তৎকালিন এমসিএ), আমিনুল হক মাষ্টার, ইসমাঈল হোসেন তালুকদার, ফজলুল হক তালুকদার, এ. এফ. রশীদ, সাইফুল ইসলাম, ডাঃ সামছুল আলম সহ আরো বহু নাম না জানা নেতা কর্মী।

চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুর রব (হাজীগঞ্জ)। তিনি ভারতে চলে য়াওয়ার পর সভাপতি হন প্রাক্তন এমসিএ আব্দুল করিম পাটওয়ারী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রথমে এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম তিনি ভারতে চলে যাওয়ার পর এডভোকেট আবুজাফর মাঈনউদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চাঁদপুর ডি.এন. হাই স্কুলের শিক্ষক জীবন কানাই চক্রবর্ত্তী ছিলেন পরিষদের অফিস সেক্রেটারী। এই পরিষদের অফিস ও প্রথম ওয়ার ফিল্ড হেডকোয়ার্টার ছিল হাজীগঞ্জ থানার চেড়িয়ারা গ্রামের লন্ডনীবাড়ি বলে খ্যাত করের বাড়ী।

এ বাড়ীকে ঘিরেই গড়ে উঠে চাঁদপুরের প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের অসামান্য দুর্গ। চাঁদপুরে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্থাপন করছে ৩১তম ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার, যার নেতৃেত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান। পাক আর্মিতে যিনি স্বনামেই খ্যাত ছিলেন । তার সাথী ছিলো ১৬০০০ উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার আর্মি, সাথে সহযোগী সশস্ত্র রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পাকিস্তানী রেঞ্জার মিলিয়ে আরো ১০/১৫ হাজার সেনা। এই বিপুল শত্রু সেনার বিরুদ্ধে আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞায়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হালকা অস্ত্রধারীমুক্তিবাহিনীর যাত্রা শুরু হয় এই বাড়ি থেকেই। চেড়িয়ারা গ্রামের লন্ডনী বাড়ি মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসে এক মাইল ফলক।

পাঠান বাহিনীর প্রথম পুর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ও চাঁদপুরের 'কুয়েতথান' ক্যাঃ (অবঃ) জহিরুল হক পাঠান

ষোল নভেম্বর দু'হাজার পাঁচ । আর এক মাস পেরুলেই ষোল ডিসেম্বর, বাঙ্গালীর বিজয় দিবস। ঘন কুয়াসার চাঁদর প্রকৃতিকে পরিপূর্ণভাবে মুড়ে দিয়েছে। বাতাসে হিমেল হাওয়া বইছে। হেমন্তের শেষ মাস আসন্ন শীতের জানান দিচ্ছে। লজ্জিত সূর্য হয়তো আজ আর মুখ দেখাবে না। তবুও আজ আমরা ক'জন মুক্তিসেনা প্রাণের টানে ঘর থেকে বেরিয়েছি। চাঁদপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য-সচিব হিসেবে, একটি অনাকাংখিত, অসহ্য এবং লোমহর্ষক দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে তারপর সামাল দিতে হবে বিক্ষুব্ধ জনতাকে। ১৫ নভেম্বর ২০০৫, অর্থাৎ ১৪১২ বঙ্গাব্দের অগ্রাহয়নের প্রথম দিন প্রত্যুষে, ৫৫ বছর বয়সের এক শক্ত সামর্থ মানুষের লাশ পাওয়া গেছে ডাকাতিয়া নদীর গাজীপুর বাঁকে।

হেমন্তের প্রথম মাসের শেষ দিন দিবাগত রাতে নির্মমভাবে দুস্কৃতিকারীরা হত্যা করেছে, এই প্রৌঢ় মানুষটিকে। ধানুয়া মিজি বাড়ির সম্মুখে এখন বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড়। স্বজন হারানো হাজারো মানুষের আর্তনাদ চারপাশের আকাশ বাতাসকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। আমার সম্মুখে রাখা হলো লাশটি। আমি আঁতকে উঠলাম, লাশটির দিকে তাকিয়ে। ডান বাম দু'টি হাতই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন, এই সবল হাতে একদিন তিনি রাইফেল ধরেছিলেন। পা দু'টো দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, চোখ দু'টো দানবীয় আক্রোশে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিৎ। শরীরে আঠারোটি ধারালো অস্ত্রের কোপ। কান্না চেপে রাখতে পারছিলাম না।

নিহত শাহ জামাল একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমার ক্ষোভ আর বিস্ময় তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। শাহ জামালকে দাফন করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মান তার প্রাপ্য।

আমরা অপেক্ষা করছি, ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসবেন, সাথে নিয়ে আসবেন ফুলের মালা এবং জাতীয় পতাকা। থানার ওসি আসবেন, একজন মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম যাত্রায় শরিক হবে। রাষ্ট্রীয় সালাম দিয়ে বলবেন তুমি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তোমাকে সশ্রদ্ধ সালাম!

না, জাতির দুভার্গ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসেননি, তিনি একজন প্রায় বৃদ্ধ কর্মচারীর হাতে জাতীয় পতাকা পাঠিয়েছেন, জিজ্ঞেস করলাম ইউএনও সাহেব কোথায়? বৃদ্ধ কর্মচারিটি বললো 'স্যার অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন'। থানার ওসি সাহেব আসেন নি, যদিও তিনি দপ্তরেই উপস্থিত ছিলেন। বাজেনি কোন বিউগল। দেওয়া হয়নি ফুলের মালা। আমরাতো আর আমাদের রণাঙ্গনের সাথীকে ফেলে দিতে পারি না তাই অশ্রুস্বজল চোখে তাকে বিদায় দিলাম। উপস্থিত হাজারো জনতাকে জিজ্ঞেস করলাম শাহ জামাল কে ছিলেন? অযুত কণ্ঠে জবাব এলো তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

আবারো আমি জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলাম তিনি কেমন লোক ছিলেন? কাল বিলম্ব না করে জনতা উত্তর করলো ভালো লোক ছিলেন, সৎ লোক ছিলেন, গরীব ছিলেন, রিক্সা চালাতেন। আমরা তাকে তার বাড়ির কবরস্থানে দাফন করলাম। দাফনের পর শোকাহত লোকজন বিক্ষোভে ফেটে পড়লো ---।

আমার শান্তনা, আমাদের রক্ত, ঘাম আর জীবনের বিনিময়ে কেনা স্বদেশে কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওসি, ইউএনও ওরা না আসুক, না বাজুক কোন বিউগল, নাইবা ফুলে ফুলে ঢেকে দেওয়া হোক লাশটি। যাদের জন্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো শাহ্ জামাল। সেই হতদরিদ্র মানুষেরাতো এসেছে নয়নের জলে বুক ভরা ক্ষোভে বিদায় জানিয়েছে একজন মুক্তিসেনাকে।

আবারো শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো আমার, দেশের গণ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধা। আজ আমার দেশের সর্বত্র '৭১ সালের বেঈমানদের জয় জয়কার। তাদের শক্তি দাপটে মুক্তিযোদ্ধারা সন্ত্রস্ত। তাদের গাড়ীর ধুলায় ঢেকে যাচ্ছে পথের পাশের স্মৃতিযৌথ। বয়ঃবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা আজ বড়ই অসহায় এখন তাদের স্বজনের বড়ই আকাল।
ধানুয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ডাকাতিয়া নদী এখন স্রোতহীন তাই স্থবির, ঠিক আমাদের মতই। চৌত্রিশ বছর আগে শাহজামাল মিজি আর আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন ডাকাতিয়া নদীও যৌবনবতী ছিলো। আমাদের চওড়া কাঁধে তখন শানিত বেয়নেট সহ রাইফেল ছিলো। আমি ফিরে যাই চৌত্রিশ বসন্ত আগে।

উনিশ'শ একাত্তরের সাতাইশ এপ্রিল মঙ্গলবার। সেদিন যদিও বৈশাখ মাসের ১৪ তারিখ গ্রীষ্মকাল, তবুও সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপছিলো। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবে। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে আকাশ জুড়ে কালো মেঘের খেলা। অকাল বৃষ্টি জনিত আবহাওয়ার কারণে চর্তুদিকে একটা নিস্ত বব্ধতা। দেশের মানুষ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ওরা লড়াই চায়, আঘাত হানতেচায় কায়েমী স্বার্থবাদীদের দুর্গে। পঁচিশে মার্চ '৭১ যে আঘাত করা হয়েছে। নিরস্ত্র বাঙালী জাতির ওপর, তার প্রতিশোধ চাই, পাল্টা আঘাত চাই।

পাঠান বাহিনীর জন্যে আজ অগ্নিপরীক্ষা। পাইক পাড়ায় সংগঠিত হওয়ার পর, বিশ এপ্রিল একাত্তর ফরিদগঞ্জ খাদ্য গুদাম দখল করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা ছাড়া পাঠান বাহিনীর ঝুলিতে তখনও বড় কোন সাফল্য জমা হয়নি। পাঠান বাহিনীর প্রাণ পুরুষ ক্যাঃ (অবঃ) জহিরুল হক পাঠান, অমিততেজ মুক্তিসেনা। বাহুতে তার অসিম শক্তি, বুকে দুরন্ত সাহস। তার সামরিক প্রতিভার কোন তুলনা নেই। পাঠান বাহিনীর প্রধান তাত্ত্বিক ও পরামর্শ দাতা বি এম কলিম উল্লাহ। তিনি বাংলার কমিনিষ্ট পার্টির সদস্য। বিপ্লবী মন্ত্রে আজীবন বিশ্বাসী। পাঠান আর কলিম উল্লাহর যোগ্য নেতৃত্বে গড়ে ওঠেছে পাঠান বাহিনী। ২০-০৪-৭১ মুক্তিসেনারা ফরিদগঞ্জ খাদ্য গুদাম ভেঙ্গে পাকসেনাদের মজুতকৃত খাদ্য লুঠ করেছে। এই খবর চাঁদপুরে পাকবাহিনীর কাছে পৌছার পর তারা ফরিদগঞ্জ আক্রমণের জন্য তৎপর হয়ে উঠে । ২/১ দিনের মধ্যেই তাদের প্রতিক্রিয়া তারা ব্যক্ত করবে এটা নিশ্চিত। বি. এম কলিম উল্লাহ্ তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, তিনি পাঠানকে বললেন, পাঞ্জাবীরা অবশ্যই ফরিদগঞ্জ আসবে এবং আমাদের অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্যে প্রচন্ড আঘাত করবে।

তাই অপেক্ষা না করে অনতি বিলম্বে ওদের ওপর আঘাত করার জন্যে একটা যুৎসই স্থান বেছে নিতে হবে। একদিন রাতে ঠিকই পাকবাহিনী ফরিদগঞ্জে চলে এলো। সেদিন ছিলো পঁচিশ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযান শুরুর এক মাস পরের ঘটনা । প্রথম দিকে তারা ফরিদগঞ্জের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে তাদের অবস্থানকে সু-দৃঢ় করে। পাঠানবাহিনীর লোকজন এই বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছে।

২৬ এপ্রিল দ্বি-প্রহরে খবর এলো ফরিদগঞ্জে অবস্থানরত পাকবাহিনীকে অস্ত্র সস্ত্র ,গোলাবারুদ খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ ও মুক্তিসেনাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে একটি লঞ্চ ভারী অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে চাঁদপুর থেকে

ফরিদগঞ্জ অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে পাঠান বাহিনীর কিছু বিশ্বস্ত লোক পাকবাহিনীর দালাল হিসেবে ওদের সাথে যোগ দেয়। তারা গোপনে প্রয়োজনীয় খবরাখবর জানাতে থাকে। এ লোকগুলো জীবন বাজি রেখে প্রতিক্ষণ ইচলীর নির্দিষ্ট পয়েন্টে খবর পৌছে দিতে থাকে। সেখান থেকে সাইকেলে করে একজন খবর বয়ে আনে সদর দপ্তরে।

তখন মুক্তিসেনার অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার ছিল পাইকপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে ও সংলগ্ন হাই স্কুলে। খবর সংগ্রহের যে নেটওয়ার্ক ছিল তা একমাত্র সংগ্রাম কমিটির ২/১ জন সদস্য সেনা অধিনায়ক পাঠান ও বি. এম. কলিম উল্লাহ ছাড়া কেউ জানত না। পাকবাহিনী আসছে এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাঠান তার অধীনস্থ কমান্ডারদের নিয়ে যুদ্ধের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি বলেন, আজকের প্রথম আক্রমণে আমরা যদি নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে পারি তাহলে আমাদের যে সাফল্য আসবে তা হবে সুদুর প্রসারী।

আমরা এলাকার জনগণের আস্থা নিয়ে টিকে থাকব। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবল অস্ত্র আমাদের দরকার। তাই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে হবে। পেছনে ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কমান্ডার পাঠান দলের প্রতিটি সদস্যকে ব্যক্তি গতভাবে সম্মুখ যুদ্ধের ধারণা ছিলেন। তিনি সকল মুক্তিসেনাকে শপথ করালেন মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই যেনো কোন মুক্তিসেনাকে যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে যেতে অনুপ্রাণীত না করে। হয় জয় লাভ না হয় মৃত্যু।

শুরু হলো যুদ্ধ প্রস্তুতি, সেনা মোতায়েন। প্রথমে একটি প্লাটুন পাঠানো হয় চান্দ্রাবাজারে। সেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিফেন্স করার ভাল স্থান না থাকায় তারা ফিরে এলো। পুনরায় গাজীপুরে তিনদিক থেকে ডিফেন্স নিয়ে এমবুশ বসানো হলো। একটি প্লাটুন পাইক পাড়ায় রিজার্ভ রাখা হলো। সর্বাধিনায়ক জহিরুল হক পাঠানের নির্দেশে ধানুয়া এবং চান্দ্রাবাজার সংলগ্ন ফরিদগঞ্জ রাস্তায় কার্ফু দেয়া হলো। কোন লোক বাহির থেকে ভিতরে আসতে পারবে। কিন্তু বাহিরে যেতে পারবে না।

নায়েব সুবেদার জহিরের প্লাটুন মানিকরাজ নদীর বাঁকে (শহীদ মেম্বারের বাড়ীর সামনে), সুবেদার রবের প্লাটুন গাজীপুর কাঠের ব্রীজ থেকে বাজার পর্যন্ত, পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে দল ত্যাগী স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের চৌকস হাবিলদার গফুরের প্লাটুন গাজীপুর ঈদগাহ্ ময়দান ও ফরিদগঞ্জ রাস্তা কাভার করে প্রতিরক্ষা গড়ে তুললো। লেখক , আর জহিরুল হক পাঠান একই গ্রামের অধিবাসী। অল্প বয়সী হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য আরো কয়েকজন ছাত্রকে তিনি সকল সময় তার নিজস্ব প্লাটুনে রাখতেন। আজও তাদের নিজ প্লাটুনে অন্তর্ভূক্ত করে, যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। আজ আমাদের এই প্লাটুনটি গাজীপুর বাজারে মাঝখানে অবস্থান নিলো। পূর্বেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ফায়ার ওপেন হবে গাজীপুর থেকে তাঁর নির্দেশে। অর্থাৎ পাকবাহিনীর লঞ্চটি যখন আমাদের অবস্থান ও অস্ত্রের আওতায় আসবে তখন ফায়ার ওপেন হবে। ফায়ারের সাথে সাথে সামনে এবং পিছন থেকে বাকীরা শত্রুর ওপর আক্রমণ করবে। আমরা ডিফেন্সে প্রস্তুত।

রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি কখন আসবে সেই মাহেন্দ্র ক্ষণটি। বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম কমিটির লোকজন খবরা খবর পৌছানোর জন্য লোক রেখেছেন। খবর আসল পাকবাহিনী টুবগী পর্যন্ত এসে গেছে। সারা এলাকা জুড়ে স্তব্ধতা ও নিরবতা। আমরা একটি বিশেষ সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আমাদের অপেক্ষার পালা অতিক্রম করে পাকবাহিনীর লঞ্চটি আমাদের আক্রমণের সীমানায় প্রবেশ করলো। ধীরে ধীরে লঞ্চটি বাঁক ঘুরে গাজীপুর সোজাসুজি ঠিক আমাদের টারগেট বরাবর পৌছাল।

প্রতিশোধের আগুনে সেনাঅধিনায়ক সহ সকল মুক্তিসেনার রক্ত প্রবাহে তখন জোয়ার বইছে। শরীর কাপঁছে, নিজকে সামলিয়ে সর্বাধিনায়ক বজ্র কণ্ঠে আদেশ করলেন ফায়ার। শব্দটি বাতাসে উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে গাজীপুরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শুরু হলো মুক্তিসেনার মরণপন আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রিমুখী আক্রমণে পাকবাহিনীর অনেকেই গুলি খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলো। কেউ কেউ পাল্টা আক্রমণ করলেও আমাদের তিনদিকের গুলির সামনে টিকতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাদের বেশীর ভাগ নদী সাতরিয়ে অপর পাড়ে গিয়ে উঠে। ধানুয়ার ভিতর দিয়ে ফায়ার করতে করতে রাস্তায় উঠে ফরিদগঞ্জ চলে যায়।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে লঞ্চটি ছিদ্র হয়ে যায়। লঞ্চটি একসময় গাজীপুরের শেষ মাথায় শেখ বাড়ীর ডোনে (সেখবাড়ীর টেক) নিমজ্জিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা তখনও পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় নিজ নিজ ডিফেন্সে অনঢ় হয়ে আছে। কারণ পাকসেনাদের পরবর্তী আক্রমণ ফরিদগঞ্জ বা অন্যকোন স্থান থেকে আসতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করে পাঠান নির্দেশ দিতে দেরী করছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পাগল বীর বাঙ্গালী আর অপেক্ষা করতো চাইছে না, সম্ভাব্য বিপদ উপেক্ষা করে মুক্তিকামী জনতার দল আকাশ বাতাস মুখরিত করে নারায়ে তকবীর আল্লাহু -আকবার, জয় বাংলা, জয় বাংলা, শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে লঞ্চটির নিমজ্জিত স্থানে উপস্থিত হতে থাকে।

জনতা নদী থেকে পাকসেনাদের লাশ টেনে পাড়ে নিয়ে আসে। মুক্তিসেনারা অবাক বিস্ময়ে সে দৃশ্য অবলোকন করছে। জনগণের উৎসাহ দেখে সেনাঅধিনায়ক আনন্দিত হলেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দিলেন না। ইতি মধ্যে সংগ্রাম কমিটির কিছু লোক জনতাকে বুঝালেন আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জহিরুল হক পাঠানের নির্দেশ আপনারা নিরাপদ স্থানে চলে যান। যে কোন মুহূর্তে পাকবাহিনী গাজীপুরে পুনরায় আঘাত হানতে পারে। জনগণ নির্দেশ মেনে দুরে চলে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পর মুক্তিসেনাদের কড়া পাহারার ব্যবস্থা নিয়ে ডিফেন্স বসানো হলো। সারা রাত দারুন উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলো। পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই জনগণ সেনাঅধিনায়কের হুকুম পেয়ে নিজেরাই পানিতে নেমে রশি বেঁধে লঞ্চটি টেনে পাড়ে নিয়ে এলো। লঞ্চটিতে ছিল প্রচুর অস্ত্র। আমরা পাকবাহিনীকে পরাজিত করেছি এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। জনতার ঢল কোন প্রকার বাঁধা মানলো না। সবাই গাজীপুরে এসে হাজির। যুদ্ধ জয়ের এই সাফল্য পাঠান বাহিনীর শক্তিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। ২টি হেভি মেশিন গান, ১টি ৩ ইঞ্চি মর্টার , ১টি রকেট লাঞ্চার , ৪টি চাইনিজ এলএমজি ও রাইফেলসহ প্রচুর গোলা বারুদ মুক্তিসেনাদের দখলে আসে।

সেনাঅধিনায়ক হাবিলদার গফুরকে দিয়ে কড়াইয়ে গরম করে বুলেট গুলি ব্যবহারের উপযোগী করে নিলেন। এই দখলকৃত অস্ত্রকে সম্বল করে শুরু হলো পাঠানবাহিনীর নতুন অগ্রযাত্রা। তারপর পাঠান বাহিনীর ঝুলিতে জমা হতে থাকলো একের পর এক যুদ্ধ জয়। এরুপ '৭১ সালের বিভিন্ন সময়ে পাক সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬৪টি যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি, প্রতিটি যুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর নথিতে সম্মানের সাথে লিপিবদ্ধ করা আছে।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হওয়ার পর প্রচার বিমুখীতা ও রাজনৈতিক কারণে চাঁদপুর জেলার গৌরবোজ্জল মুক্তি সমরের ইতিহাস অজানা থেকে গেছে। ডাকাতিয়া নদীর এই গাজীপুর বাঁকে ১৯৭১ সনে আরো দুটো যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো। দ্বিতীয়টি ১৫/৯/৭১ তারিখে ও তৃতীয়টি ১৮/১০/৭৮ তারিখে। প্রথম গাজীপুর যুদ্ধে লেখকসহ তার গ্রামের আরো ১০ জন মুক্তিসেনা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে নায়েব সুবেদার আঃ ছাত্তার (প্রয়াত), হাবিলদার আঃ গফুর, নায়েক মোস্তফা কামাল,

লেখকের অনুজ প্রতিম এবিএম মহসীন নয়ন বন্ধু অজিৎ সাহা, বন্ধু ডাঃ দেলোয়ার হোসেন খান আরো অনেকে। যাদের নাম এ মুহূর্তে লেখকের মনে নেই। আর এই প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকেই দেশ শত্রু মুক্ত হওয়া পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার সকল মুক্তিসেনা প্রতিটি সংগ্রামে একাত্ম ছিলো।

একটি কথা না বলেই নয় যে, স্বায়ত্ব শাসনের জন্যে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণে ইয়াহিয়া খানের টালবাহানা বাংলার জনগণকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলো। যতই সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল জনতার সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ছিলো নির্বাচন মুখী একটি রাজনৈতিক দল। তাদের আদর্শ ছিলো গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র। গুটি কয়েক বাদে প্রায় সবাই অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ বলতে যা বুঝায় সে হিসেবে লাঠিসোঠার সমাবেশ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তুতি তাদের ছিলো না।

তবে তারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এ কথা সঠিক। জাতীয় ঐক্য প্রকৃত যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এটা বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে। দেশে মুক্তিযুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতা প্রস্তুতিহীন কর্মকা জাতিকে অসহায়ের মত ঘাতক বাহিনীর অস্ত্রের সম্মুখে ঠেলে দেয়। সে সময় পাকসেনাবাহিনীর দল ত্যাগী বাঙ্গালী সৈনিকরা যদি রুখে না দাঁড়াতো তাহলে কার্যকর প্রতিরোধ ছাড়াই স্বাধীনতা যুদ্ধ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

স্বাধীনতার দাবী একদিন হয়তো হাওয়ায় মিশে যেতো। আজ আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিবিদ যখন সেনাবাহিনীকে নিয়ে কটাক্ষ করেন তখন মনে হয় জাতি হিসেবে আমরা খুব একটা কৃতজ্ঞ নই। চাঁদপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ পরিচারনায় একজন ব্যক্তির নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে তিনি হচ্ছেন বিএম কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া। এই বেসামরিক ব্যক্তিটির সামরিক প্রতিভা সত্যিকার অর্থে ছিলো ঈর্ষনীয়। জনাব ভূঁইয়ার পরিকল্পনা গাজীপুর যুদ্ধ জয়ের একটি অন্যতম প্রধান দিক। মূলতঃ তার বিপ্লবী চিন্তা চেতনা আর ক্যাঃ (অবঃ) জহিরুল হক পাঠানের সামরিক মেধা ২৭-০৪-৭১ মুক্তি সেনাদের অসম শক্তির বিরুদ্ধে সাহস এবং শক্তি জুগিয়েছে। আরো অনেক সফল সামরিক কর্মকা পরিচালিত হয়েছে তাদের যৌথ প্রযোজনায়।

গাজীপুরের প্রথম যুদ্ধকে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বিস্ময়কর শুভযাত্রা বলা যেতে পারে। পাক সেনাবাহিনী বর্জনকারী বাঙ্গালী সেনা সদস্য, বিমান সেনা, নৌ-বাহিনীর সৈনিক তৎকালীন ইপিআর ও পুলিশের কতিপয় সদস্যসহ লেখক ও তার কিছু স্বধীর্থ ছাত্র, যুবক শ্রেণী সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুকে অভিসম্ভাবি পরিণতি জেনেও স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে আনার মানসে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন।

মার্চ মাসের ১৮ তারিখ অলিপুর দীঘির পাড়ে গড়ে ওঠা পাঠান বাহিনীর মধ্যে প্রচুর দক্ষ সৈনিক থাকা সত্ত্বেও প্রথমদিকে অস্ত্রের মধ্যে ছিলো দু'-চারটি বেসামরিক শিকারী বন্দুক। তাছাড়া যুদ্ধ করার মত তেমন কোন হাতিয়ার ছিলো না। একদা মামলা রুজু করার কৌশলে হাজীগঞ্জ থানায় গিয়ে পুলিশ সদস্যদের নিরস্ত্র করে ৬টি রাইফেল, একটি পিস্তল, ২৬৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলি সংগ্রহ করা হয়। এ অপারেশনের মূল হোতা কলিম উল্যা ভূঁইয়া। এরপর গেরিলা কায়দায় একজন পাকসেনাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে প্রচুর গুলি ও একটি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

গাজীপুর যুদ্ধ আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের 'তুয়া-হাই' নামক স্থানের একটি দুর্ধর্ষ লড়াইকে। একটি মাত্র কারবাইন দিয়ে শত্রুর একটি বিরাট ইউনিটকে আত্মসমর্পণ করিয়ে ও হাতিয়ার

সংগ্রহ করার মানসে সাধারণ ভিয়েতনামীদের একজন প্রাক্তন সেনা সদস্য 'কুয়েতথান' সংগঠিত করেছিলেন। এটি ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে একটি দুর্ধর্ষ বিজয় ছিলো। ভিয়েতনামীরা এই কারবাইনকে জননী কারবাইন এবং এই যুদ্ধকে জননীযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে। এই যুদ্ধের পরিচালক ও পরামর্শদাতা ছিলেন 'কুয়েতথান' নামক ঢ্যাঙা, রোগাকৃত একজন যুবক যিনি একটি কৃষক পরিবারের প্রাক্তন সেনা সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে সময়ে অসংখ্য যুদ্ধের সাফল্য দেখিয়ে তিনি রেজিমেন্ট কমান্ডার হন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জহিরুল হক পাঠান এই ধরনের একজন 'কুয়েতথান' ছিলেন। আমরা তার অবদানের জন্য গর্বিত। সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য গাজীপুর গ্রাম যুদ্ধকে আমাদের এলাকার প্রথম বিজয় বলা হয়।

প্রবন্ধটি আমি শুরু করেছিলাম নৃসংসভাবে খুন হওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজামাল মিজির দুঃখজনক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। প্রথম গাজীপুর যুদ্ধে শাহজামাল ছিলো একজন যুবক কৃষক, পরবর্তীতে সে রূপান্তরিত হয়েছিলো একজন অকুতভয় মুক্তি সেনায়। যে গাজীপুর বাজার সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে সে পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের লাশ চওড়া কাঁধে বয়ে নদীর পাড়ে তুলে এনেছিলো, সেই একই স্থানে পাকসেনাদের দোসরদের বর্তমান প্রজন্ম তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। তার রক্ত ঘামে অর্জিত স্বদেশে, পেটে ছিকনাই জমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পেট মোটা ওসি আসেননি তাকে শেষ অভিবাদন জানাতে।

অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মাছের ঘেরের দুর্বিনীত তস্করদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা বলেছেন শাহজামাল বেআইনী ভাবে গড়ে ওঠা মাছের ঘের থেকে 'মাছ চুরি করতে' গিয়েছিলেন। কি বিচিত্র এই দেশ। ''সাধুবেশে বেটারা চোর অতিয়শয়।'' ১৭ বছর বয়সে মোহাম্মদ বিন কাশিম সিন্দু বিজয় করেছিলেন। ১৮ বছর বয়সে গাজীপুর যুদ্ধ আমার কাছে তেমনই একটি বিজয় ছিলো– আজ আমি আমার দুরন্ত যৌবন ফেরত চাই– হে জাতি আমার রাইফেল ফিরিয়ে দাও– আমি আর একটি মুক্তিযুদ্ধ লড়তে চাই। অমানুষ খুনের নেশায় আমি হতে চাই ভয়ঙ্কর ।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ঃ

চাঁদপুরের অসংখ্য সন্তান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আত্মাহুতি দিয়েছেন। তার মধ্যে শহীদ জাভেদ, হাবিলদার সিরাজুল ইসলামসহ ২১৭ জনের নাম প্রণীত হয়েছে। ২৫ মার্চের কালো রাতে সেনা সেনা নিবাসে। সেনানিবাসে যুদ্ধ শুরু হলে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষনা করে। এক তরুন সেনা অফিসার যশোহর সেনা নিবাসে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে শহীদ হন। এই অসীম সাহসী যোদ্ধার নাম ২য় লেঃ শহীদ আনোয়ার হোসেন বীর উত্তম তাঁর বাড়ি চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার সোনাপুর গ্রামে। তার নামে ঢাকা সেনানিবাসে একটি স্থাপনা রয়েছে।

অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় নেই। সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ চাঁদপুরের শহীদ বৃন্দের তালিকা ঃ (১) তাহের (২) আব্দুর রশিদ (৩) জয়নাল আবেদীন (৪) আলী আওয়াল চৌধুরী (৫) নুর হোসেন (৬) আব্দুল মান্নান খান (৭) কুদ্দুছ গাজী (৮) কালাম ভূঁইয়া (৯) আলম খান (১০) রুহুল আমিন (১১) আজিজুর রহমান (১২) জয়নাল আবেদীন (১৩) আবু আজ্জম (১৪) আব্দুল মতিন (১৫) জতির এমদাদুল হক (১৭) শহিদ উল্লাহ জাবেদ (১৮) কালাম (১৯) ইউসুফ খা, শহীদ মুক্তিসেনা হিসেবে ২য় লেঃ আনোয়ারসহ চাঁদপুর জেলার বিশজন শহীদের নাম সেনাবাহিনীর তালিকায় থাকলেও সরকার আরো ১৯৭ জনের নাম তালিকা ভুক্ত করেছেন যাদের মধ্যে কৃষক শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মীরাও রয়েছেন।

চাঁদপুরে গণহত্যা ঃ

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার কাশিমপুর, লাউকরা, কচুয়া থানার রঘুনাথপুর বাজার ও চাঁদপুর সদর থানার ছোট সুন্দর গ্রামে চারটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সামছুল হক তালুকদার (কালু ভাই) ছোট সুন্দর গ্রামের এই গণহত্যার শহীদ হন। চাঁদপুর জেলা শহরের বড় স্টেশন, হাজীগঞ্জ থানার হামিদিয়া জুট মিল, টোরগড় জুনাব আলী ময়দানের দাতব্য চিকিৎসালয় ইচলী রেস্ট হাউজসহ আরো দু'-তিনটি স্থানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বধ্য ভূমি স্থাপন করে হত্যাকান্ড চালিয়েছিলো।

একাত্তরের নারী নির্যাতন ও চাঁদপুর জেলার চারটি গণহত্যা

আজ ফাল্গুনের আঠার, তবুও ঘন কুয়াসা আস্তরণ ভেদকরে সূর্য ওঠতে পারছে না। লেখক তার বড় ছেলে সজীবকে সাথে করে, জেলা শহর থেকে একত্রিশ কিলোমিটার দুরে এসেছেন। হাজিগঞ্জ থানার লাওকরা গ্রামে। ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছুঁই ছুঁই। লাওকরা ছোট ফকির বাড়ি ও বড় ফকির বাড়ির মাঝে একটা খোলা মাঠ। মাঠের পুর্ব পার্শ্বে দু'টো গ্রাম্য চায়ের দোকান।পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলো থেকে ছেলে বুড়ো অনেকেই এসেছেন প্রাতঃরাশ, বিশেষ করে চা পানের জন্যে। আমরা চা পানের ফাঁকে আলোচনার সুবিদার্থে একটি দোকানে প্রবেশ করলাম। ছোট খাট একটা জটলার সৃষ্টি হলো আমদের ঘিরে।

আমাদের রিকশা চালক হাসান এ গ্রামেরই ছেলে, যুদ্ধ দেখেনি উনিশ বছর বয়সী এই যুবক। তবে বাবা মার কাছে যুদ্ধের কথা শুনেছে। লাওকরা গ্রামের গণহত্যার কথা শোনার জন্যে এবং নিহত মানুষ গুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লেখকের এ সফর। গণহত্যাযজ্ঞের শিকার যে কোন জনগোষ্ঠীই তাদের ক্ষয়ক্ষতি ইতিহাসবদ্ধ করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে থাকে। লেখক অতিরঞ্জন এড়িয়ে প্রকৃত সত্য জানাতে চেষ্ট করবেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানী সেনাবহিনী ও সাম্প্রতিককালের তাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা সংগঠিত নরমেধযজ্ঞকেও মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, নিষ্ঠুর হত্যালীলা ইত্যাদি শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, রক্তই যদি স্বাধীনতার মুল্য হয় তবে বাঙ্গালী জাতি সর্বোচ্চ মুল্য দিয়েছে। তাই লেখক তার জেলায় ঘটে যাওয়া গণহত্যার স্থানগুলো দেখতে চান, তার বর্ণনায় স্বাভাবিক অতিরঞ্জন অবশ্যই অনুপস্থিত থাকবে। প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কথার বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ একটি রিপোর্ট বের করে।

ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যে সমস্ত গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে। রিপোর্টে নিহতের সংখ্যা সর্বনিম্ন গণনায় অন্তত ১৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার লোক নিহত হয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনাসমুহে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটি সর্ব্বোচ্চ। এদিক থেকে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার হত্যাকান্ড নিঃসন্দেহে মানবেতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যাযজ্ঞ। চাঁদপুর জেলা ও এর বাইরে নয়।

চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ হামিদিয়া জুট মিল, চাঁদপুর বড় স্টেশন, ফরিদঞ্জ ডাক বাংলো ইত্যাদি স্থান গুলো ছাড়াও অনেক গ্রামগঞ্জেও গণহারে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। নিষ্ঠুতার দিক দিয়ে হত্যাযজ্ঞের তুলনা কোন তুলনা নেই।

অন্য কোন সূত্র না ঘেঁটে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প প্রণীত খন্ডমালার অষ্টমখন্ডে গ্রন্থিত প্রতক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানবন্দীর কয়েকটি পাঠ করলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন কেবলমাত্র ধর্ষককামী বিকৃত মস্তিস্ক খুনীরা ছাড়া আর কেউ এরুপ জঘন্য ঘটনার জন্ম দিতে পারে না। লেখক চাঁদপুর জেলায় সে সময়ে ঘটে যাওয়া অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের মধ্যে শুধু বড় চারটি ঘটনার বর্ণনা তার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিলো যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় ২২ মো ১৯৭১। হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছিলো এককভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা। হাজিগঞ্জ থানার সর্বদক্ষিণ পুর্বের গ্রাম কাশিমপুরে। দ্বিতীয় গণহত্যাটি সংঘটিত হয়েছিল চাঁদপুর থানার ছোট সুন্দর গ্রামে ১০ অগস্ট' ৭১। তৃতীয় হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছিলো কচুয়া থানার রঘুনাথপুর বাজারে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ রাজাকার বাহিনীর দ্বারা। চতুর্থ হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছিলো ২৩ অক্টোবর ১৯৭১, ১লা রমজানের দিন হাজিগঞ্জ থান সদর থেকে ৫ কিঃমিঃ পুর্বদিকে লাওকরা গ্রামে। এখানে অবশ্য পাক হানাদার ও রাজাকার বাহিনীকে চরমমুল্য দিতে হয়েছে।

প্রথম হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছে পাকসেনাদের দ্বারা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র রাজাকার বাহিনীর দ্বারা। চতুর্থ হত্যাকান্ডটি রাজাকার ও পাকসেনাদের মিশ্রণে তৈরী পাক বাহিনীর দ্বারা। এখানে হানাদারদের সাফল্য জনক ভাবে প্রতিরোধ করেছে মুক্তি সেনারা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যারাত্রিতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের সুচনা করে। নিরপরাধ নিরস্ত্র জনগনের উপর বর্বর পাক সেনারা আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাদের সাথে যোগ দেয় বিহারীদের একটি বড় অংশ এবং এদেশে জন্মগ্রণহকারী কিছু বিশ্বাসঘাতক দালাল চক্র। পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সেসব ঘটনা নতুন প্রজন্ম জানে না। অথবা তাদের ধারনা খুব স্বচ্ছ নয়। প্রথম থেকেই এই হত্যাকান্ডের খবর যাতে বিশ্ববাসী জানতে না পারে, তার জন্য পাক সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সে সময় এখানে অবস্থানরত বিদেশী সাংবাদিকদের সামরিক প্রহরাধীনে বিমান বন্দরে এনে দেশ থেকে বের করে নেয়া হয়।

যাবার আগে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় সমস্ত নোট ও ফিল্ম ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর থেকে বহিবির্শ্বে সংবাদ প্রেরণ এবং বিদেশী সাংবাদিকদের এদেশে আসার উপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপসহ বিশ্ববাসীর কাছে গোপন করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়। এখনো সে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। নব প্রজন্মের কাছে সে সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা তুলে ধরতে চায় না বেঁচে থাকা দালালরা। দালালদের নব প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন মুছে ফেলতে চায়।

ইতিহাস বিকৃত করে ঘটনা অন্য দিকে প্রবাহিত করতে চায় ওরা। কিন্তু হত্যাযজ্ঞ এতই ব্যাপক ও ভয়াবহ যা চেপে রাখা অসম্ভব। তখন যে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিক আত্নগোপন করে বা অন্য কোন উপায়ে দেশের ভেতরে থেকে বাইরে যেতে পেরেছিলেন তাঁরা এই হত্যাযজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে মর্মস্পশী প্রতিবেদেন লিখতে থাকেন।

এছাড়া সাংবাদিকসহ অন্যান্য যে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলকে পাক খুনী চক্র প্রদেশের অবস্থা স্বাভাবিক বলে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছিল, তাঁরাও এই হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতা চাক্ষুষ দেখে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন লিখেছিলেন। এ সমস্ত প্রতিবেদনের দু একটির অংশ বিশেষ পাঠ করলেই বোঝা যায় এই হত্যাযজ্ঞ কত ভয়াবহ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিলো ফলে দেশের অভ্যন্তর ভাগের খবর বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। চাঁদপুর জেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির বর্ণনা খুঁজে পাওয়া বড়ই দুস্কর, কারণ তখন কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে লিখতে উদ্যোগী হননি।

লেখক ব্যক্তিউদ্যোগে এবং প্রাণের তাগিদে সে সময়ের কিছু ঘটনার ওপর অনসন্ধান করেছেন। স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে ঘটনার সময় যারা পতক্ষ্যদর্শী ছিলেন তাঁদের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন। সেই সব অনুসন্ধান ও স্বাক্ষাতকারের ওপর ভিত নির্মাণ করেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তবে তিনি মনে করেন এ ব্যাপারে আরো ব্যাপক কাজ হওয়া দরকার। বাংলাদেশের অন্যান জেলার চেয়ে চাঁদপুর অঞ্চলের অবস্থান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারনে এখানে প্রাকসেনাদের উপস্থিতি ছিলো ব্যাপক তারা এখানে নির্যাতন হত্যা ধর্ষণ সম্পদ হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট সহ বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে এক বিভীষিকা ময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে মুক্তিকামী বাঙালীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ফলে পাকসেনারা সহজেই স্বাধীনতাকামী জনগণকে নিয়ন্ত্র করতে পারবে। বাস্তবে ঘটে অন্যরুপ ঘটনা। তাদের ধারণা ছিলো।

এক. কাসিমপুর গণহত্যা (১২.০৫.৭১)

২০০৬ সনের মার্চ মাসের ২ তারিখ, খুব প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠেছি। বড় ছেলে সজীবকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলাম কাশিমপুরের উদ্দেশ্যে। হাজিগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৭কিঃমি দক্ষিণ পূর্বের একটি প্রত্যন্ত পল্লী এই কাশিমপুর।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৯৭১ সনের ১২ মে বাংলা ২০ বৈশাখ ১৩৭৮ মঙ্গলবার, এখানে সংঘটিত হয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম নরহত্যা। বিনা অপরাধে শুধুমাত্র বাঙ্গালী হওয়ার কারণে অর্ধশতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখানে ধর্ষণ হত্যা আর আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রামকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্থ করে দিয়েছিলো পাক সেনারা। তখন এ অঞ্চলে পাকসেনাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনী সংগঠিত হয়নি।

বৈশাখ মাস রৌদ্রের তপ্তদাহে মানুষ জন ক্লান্ত অবসন্ন। ভোরের স্নিগ্ধতা শেষ হতে না হতেই হাজিগঞ্জ থানা সদর থেকে ৭০/৮০ জন পাক সেনা তাদের এ দেশীয় দোসরদেরসহযোগীতায় পল্লীর নিভৃত এই গ্রামটিতে হানা দেয়। শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত এই অযুহাত তুলে কাসিমপুরের দেবনাথ পাড়ার প্রতিটি ঘরে হানা দেয় বর্বর পাকসেনারা। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় বহু সাজানো সংসার।

যুবতী নারীদের ধরে জড়ো করে একটি ঘর। দল বেঁধে ধষণ শেষে গুলি করে হত্যা করে তাদের। পাকিস্ত নীদের এই নারকীয় কর্মকান্ডে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে দোপাল্লা গ্রামের আনা মিয়া, পরবর্তী সময়ে রাজাকার এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ সময় সক্রিয় ছিলো আনা রাজাকার বহু স্বাধীনতাকামী কে হত্যা করেছিলো।

সেদিন দেবনাথ পাড়ার একটি ঘরে স্বামীর সাথে শুয়ে ছিলো আঠার বছরের সুন্দরী লক্ষ্মী রাণী দেবনাথ। পাশেই ছিলো তার সদ্যপ্রসূত সন্তান বাবুল দেবনাথ। শিশুটির তখনও মুখে বোল ফুটেনি, তারই সম্মুখে পাকপশুরা নির্মমভাবে হত্যা করে শিশুটির বাবা-মাকে। সেদিন সকাল বেলা দশঘটিকার সময় গ্রামটি ঘিরে ফেলে নারকীয় উল্লাসে মেতে ছিলো পাক সেনারা। দীর্ঘ চার ঘন্টা ধরে চলে বাড়িঘর পোড়ান নারী

নির্যাতন ও গণহত্যাকান্ড। সেদিন অর্ধশত লোক নিহত হয়েছিলো বলে জানা যায়। দেবনাথ পাড়ার প্রবেশ মুখে বর্তমানে রয়েছে একটি গণসমাধি। পাকসেনারা যাদের হত্যা করে ছিলো।

তাদের মধ্যে যাদের সনাক্ত করা হয়েছিলো তারা হচ্ছেন ঃ ১। সুবাস দেবনাথ ২। তার মা শ্রীমতি দেবনাথ ৩। ভাই জয়দেব দেবনাথ ৪। বিলাসী সুন্দরী ৫। তার স্বামী কৃষ্ণকুমার দেবনাথ ৬। উপেন্দ্র দেবনাথ ৭। ললিত মোহন দেবনাথ ৮। চারুবালা দেবনাথ ৯। তার মেয়ে পারুবালা দেবনাথ ১০। ছেলে বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ ১১। সুখদা সুন্দরী দেবনাথ ১২। ইন্দু বালা দেবনাথ ১৩। চন্দনা রাণী দেবনাথ ১৪। মানসিক ভারসাম্যহীন রফিকের মা ১৫। বিধান সুত্রধর ১৬। বিশু সুত্রধর আরো অনেকে।

ঘটনার দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী ঃ ১। সুবাস দেবনাথ তখনা তিনি বার বছরের কিশোর ছিলেন ২। রাখাল দেবনাথ তখন দুধের শিশু ছিলেন।সুবাস দেবনাথের চোখের সম্মুখে এই নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছিলো। আহত হয়ে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। পাকসেনারা স্থান ত্যাগ করার পর আহতদের চিকিৎসা ও সাহয্যে স্থানীয় জনসাধারণ এগিয়ে আসেন। আহতদের চিকিৎসার জন্যে অনত্র সরিয়ে নেন।

পঁয়ত্রিশ বছর পর লেখক ও তার বড় ছেলে সজীব কাশিমপুর দেবনাথ বাড়িতে বসে প্রত্যক্ষদশীর্দের মুখ থেকে ঘটনার বিবরন শুনেন। লেখকের সথে ছিলেন গন্ধর্ব্বপুর (দঃ) ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ।প্রাথমিক বিদ্যালয়েলর শিক্ষক সামছুল হক মুন্সী তারা দু'জন ঘটনার প্রত্যক্ষদশী, আবুল কালাম ঘটনার পর পরই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২০০৩ সালে রাজাকারদের নবপ্রজন্ম তাকে জীবনে মেরে ফেলতে হামলা চালিয়ে ছিলো।

তারা জানান হত্যাকান্ডের সময় পাকসেনাদের বাঙালী দোসরদের নেতা ছিলো আনা মিয়া। সে পরবর্তী সময়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। দেশের বিজয় অর্জনের পর মুক্তি সেনারা গণ আদালতে বিচার করে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয় এবং তা কার্যকরী করে। পাক সেনাদের গুলিতে আহত নির্যাতিত দৃ'জন যুবতী বেঁচে গিয়েছিলেন। বর্তমানে একজনের বয়স ৫৫ বছর তখন ২০ বছর বয়সী ছিলেন। পেটেগুলি বিদ্ধ হয়েছিলো তার।

মৃত ভেবে পাক সেনারা তাকে ফেলে যায়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার তুলনা নেই। তার দুঃখ আজ পর্যন্ত কোন সরকার বা স্বাধীন দেশের মানুষ তার খোঁজ করেনি। তিনি হারিয়েছিন তার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ট সম্পদ অথচ তার রক্তঘামে অর্জিত স্বদেশের শাসন ক্ষমতায় এখন রাজাকার। এ দুঃখ তিনি সইতে পারছেন না। লক্ষী রাণী দেবনাথ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অসুস্থই আছেন।

দ্বিতীয় জন শ্যামলী দেবনাথ ঘটনার সময় তার বয়স ছিলো ১৮ বছর। পাক সেনাদের গুলিতে একটি হাত সম্পূর্ণ অকেজ হয়ে যায় তার, কনুই পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তারও একই ক্ষোভ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করলো অথচ স্বাধীন দেশের কোন সরকার বা নেতা আজ পর্যন্ত তাদের একটু খোঁজ খবরও নেয়নি।

লেখকের সফর সঙ্গী ছেলে প্রশ্ন করলো, ''বাবা কাদের জন্যে তোমরা লড়েছ ? এই ভদ্রমহিলারা তাদের জীবন যৌবন ব্যয় করেছে দেশের স্বাধীনতার জন্যে অথচ আজ ওদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। স্বাধীনতার জন্যে নিগৃহীত দুজন বীর নারী, হারিয়েছেন সব কিছুই। ওরা মানুষের দ্বারে ভিক্ষা করবে একমুঠো অন্ন জোগাবার জন্য, মাথাগোঁজার এতটুকু আশ্রয়ের জন্য, চিকিৎসার

অভাবে তারা ধুঁকে ধুঁকে মরবে আর ঘাতক দালালরা মন্ত্রীসভার আসন অলংকৃত করবে, লক্ষ কোটি টাকার বৈভব গড়বে এরই জন্য কি তোমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলে ?'' লেখক নিরুত্তর থাকলেন। প্রিয় পাঠক আপনাদের কি কোন উত্তর জানা আছে ? লেখকের মনে পড়ে গেল তার গ্রামের ভিখারী মুক্তিযোদ্ধা খলিল সর্দারের কথা গাজীপুর যুদ্ধে যখন মুক্তিসেনাদের নেতা জহিরুল হক পাঠান ছাত্র, শ্রমিক, জনতা ও পাক বাহিনী ত্যাগী মুক্তিসেনা সবাইকে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াইয়ে লিপ্ত, তখন শত শত জনতা দুর থেকে দেশীয় অস্ত্র টেডা (বর্শা) লাঠি শাবল ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। কখন পাকবাহিনীকে জীবিত ধরতে পারবে। পাকবাহিনী বুঝতে পারল তাদের বুলেট শেষ হলেই বাঙালী জনতার হাতে নির্মমভাবে মরতে হবে তখন তারা লড়াইয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিল লাশ সরানো ও পালিয়ে যাবার কাজে। এদিকে মুক্তিসেনাদের বুলেটও প্রায় শেষ তাই মুক্তি সেনারা পজিশনে থেকে মাঝে মাঝে ফায়ার করছিলো।

সেই সংকট পূর্ণ সময়ে দু'জন তরুন, কৃষি শ্রমিক ও নৌকা মাঝি ডাকাতিয়া নদীতে নেমে অসীম সাহসে ডুবন্ত পাক লঞ্চ থেকে গুলির বাক্স সংগ্রহ করে ছিলো। যুবকদ্বয় পরবর্তী সময়ে মুক্তিসেনাদের দলে নাম লিখিয়ে ছিলো। সে দিনের তরুন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের একজন ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে মাছের ঘের মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া দুস্কৃতিকারীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন।

১৬ তারিখে লেখক চাঁদপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য সচিব হিসেবে, তার জানাজায় যোগ দিয়েছিলেন এই দুঃখজনক ঘটনার পর নিজের বিবেকের কাছে দায়ী হয়ে রয়েছেন এ কথা ভেবে পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত না হতেই নিজের হাতের অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। অপর জন অর্জিত স্বদেশ মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে কারাবরন করেন পরে ছাড়া পেয়ে হত্যোদ্যম হয়ে পরে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হন এবং বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশের অর্জিত স্বাধীনতা, খুন হয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা খলিল সর্দার ও শাহ জামাল মিজিকে কি দিলো ? বঞ্চনা, ক্ষুধা, অবহেলা আর দারিদ্র ছাড়া ? লেখক নিশ্চিত তারপরও জীবন স্থবির হবে না। ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাড়াবে সত্যি কিন্তু থামবে না। সকল কলংকেমুছে অবশ্যই সুশাসনের জয়যাত্রা অগ্রবর্তী হবে। সুশাসনে নিশ্চিত হলেই কাঙ্খিত স্বাধীনতার সুফল মানুষ পেতে শুরু করবে।

দুই. ছোট সুন্দর হত্যাকান্ড (১০.৮.৭১)

ছোট সুন্দর গ্রামটি চাঁদপুর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এখানে সুবেদার ইসলাম খান স্থাপিত অনিন্দ্য সুন্দর খুবই ছোট একটি মসজিদ আছে। একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির পার্শ্বেই রয়েছে একটি দিঘী। এই দিঘীর পাড়ে এক সময় মোঘল নৌসেনাদের কবরস্থান ছিলো। পতুর্গীজ জলদস্যুদের সাথে মোগল সেনাদের ডাকাতিয়া নদীর বাঁকে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো।

সুবেদার ইসলাম খানের নৌসেনা পতি মীরমুরাদ যুদ্ধে পর্তুগীজদের সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ করেছিলো। সেটা ছিলো ১৬১১ সালের ঘটনা। সে ঘটনার ৩৬০ বছর পরে ছোট সুন্দর বাজার ও সংলগ্ন তালুকদার বাড়িতে ঘটে গেল আর একটি দুঃখজন ঘটনা। প্রথমটি ছিলো বিজয়ের উল্লাস মুখরিত। দ্বিতীয়টি বেইমানীর কলংকে ঘেরা। এ ঘটনার সাথে ও দুস্কৃতিকারী রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু জড়িত।

১০আগস্ট ১৯৭১ পাকসেনাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনী ছোট সুন্দর বাজার ও পাশ্ববর্তী তালুকদার বাড়িতে হামলা চালিয়ে বহু নিরপরাধ নর নারীকে বিনা কারণে হত্যা করেছিলো। তৎকালীন

পূর্বপাস্তিান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারন সম্পাদক সামছুল হক তালুকদার (কালু), প্রকৌঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া সহ বহু নিরাপরাধ নরনারীকে রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু হত্যা করে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে ছোট সুন্দর ত্যাগ করেছিলো। সেদিন ভোর বেলা রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু ৬০/৭০জন রাজাকারের একটি দল নিয়ে হাজিগঞ্জ থেকে দক্ষিণে ডাকাতিয়া নদীর বাঁকে অবস্থিত ছোট সুন্দর বাজারে হামলা চালায়। তখন সকাল আটটা বাজারে সবেমাত্র বেচা-কেনা শুরু হয়েছে সাধারন মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাজাকার বাহিনী গুলি ছোড়া শুরু করে। বাজারে ত্রাস সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী ছোটসুন্দর তালুকদার বাড়িতে প্রবেশ করে হত্যা করে সামছুল হক তালুকদারকে তিনি একজন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা ছিলেন। তার চাচাতো ভাই প্রকৌঃআনোয়ার হোসেন ও রাজাকারদের গুলিতে প্রাণ হারান।

প্রকৌঃ আনোয়ার হোসেনকে তার মা স্বীয় বুকে জড়িয়ে রেখিছিলেন, রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু আনোয়ারের মাকে লথি মেরে সরিয়েদেন এবং আনোয়ারের বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করেন এই তরুন প্রকৌশলীর ভাই আবু তাহের (রুস্তম) পরবর্তী সময়ের দুর্ধষ মুক্তিসেনা কমান্ডার। সেদিন যারা রাজাকার বাহিনীর হাতে শহীদ হন তাদের একটা তালিকা লেখক সংগ্রহ করেছেন শহীদরা হচ্ছেন ঃ ১। শামছুল হক তালুকদার (কালু) ২। প্রকৌঃ আনোয়ার হোসেন (আনু) ৩। আসলাম খান (রামাপুর) বাজারে আসা একজন ক্রেতা ৪। ওহাব মিঞা ব্যবসায়ী ৫। সেকান্দর সর্দার (চাষী) ৬। আব্দুল ওয়দুদ বেপারী (কৃষক) ৭। হানু ও মনু নামে জলিল পাটওয়ারীর দুইছেলে ৮। বতু ছৈয়াল ১০। বেনু লাল শীল ১১। আব্দুল খালেক পাটওয়ারী (রামপুর) আরে আজ্ঞাত সাত জনের লাশ পাওয়া যায়।

রাজাকরদের গুলির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে বহু লোক ডাকাতিয়া নদীতে ঝাপ দেয়। সাধারণ লোকদের হত্যা করে রাজাকর কমান্ডার বাচ্চুর নেতৃত্বে রাজাকারগণ বীর দর্পে এলাকা ত্যাগ করে চলে যায়। বহু লোক আহত হয়। বর্তমানে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা আঃ রশীদ মিজি ও মকবুল তালুকদারের সাথে লেখকের কথা হয়েছে (মকবুল হোসেন তালুকদার কয়েকদিন পুর্বে পৃথিবীর সকল অবিচার পেছনে ফেলে প্রয়াত হয়েছেন)

২০০৬ সালের ২২ মার্চ লেখক জেলা, প্রশাসক জনাব তাহেরুল ইসলাম সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আখতারুজ্জামান ও জন স্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকোশলী জনাব সামছুল হক ভূঁইয়া সহ ছোট সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠনে যোগ দিয়ে ছিলেন। সেসময় উপস্থিত জনসাধারন যারা ১০ আগস্ট ঘটনার সময় ছোট সুন্দর বাজারে উপস্থিত ছিলেন তারা লোমহর্ষক সেই গণহত্যার বর্ণনা দেন। স্বাধীনতার জন্যে এদেশের মানুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছে তার উদাহরন এই ছোট একটি গ্রাম ছোট সুন্দর। লেখক কথা বলেছেন প্রতিটি শহীদ পরিবারের সাথে। সবার অনুভূতি একই প্রকার। তাদের কথা দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের স্বজনদের আত্মত্যাগে তারা গর্বিত।

মুক্তিযুদ্ধে নিহত এই বীর জনতার নাম হয়তো কোন স্মৃতি স্তম্ভে লেখা হবে না সত্যি, কিন্তু তাদের ত্যাগের কথা অঞ্চল ভিত্তিক সাধারন লোকজন মনে রাখবে লোকের মুখে মুখে কাহিনীটি চিরঞ্জব হয়ে থাকবে। কোন হানাদার বা তাদের দোসররা গণমানুষের হৃদয় থেকে বীরযোদ্ধাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না। ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ কালে বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন কানাই চক্রবর্তী, মাওলানা আঃ লতীফ ও শ্রমিক নেতা শাহ আলম লেখককে সর্বপ্রকার সহযোগীতা প্রদান করেন। স্থানীয় লোকজন ছোট সুন্দর বাজরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার জন্যে তাদের আগ্রহের কথা বলেন।

তিন. রঘুনাথপুর গণহত্যা (০৮.০৯.৭১)

মতলব, হাজীগঞ্জ ও কচুয়া এই তিন থানার সীমানায় একটি অবহেলিত জনপদ রঘুনাথপুর। তিন থানার মানুষের গড়া একটি গ্রাম্যহাট রঘুনাথপুর বাজার। মতলব থানা সদর থেকে ৮ কিঃ পূর্বে হাজীগঞ্জ থানা সদর থেকে ৭ কিঃ উত্তরে এবং কচুয়া থানা সদর থেকে ৬ কিঃ মিঃ পশ্চিমে প্রত্যন্ত পল্লীঅঞ্চলে বিখ্যাত বোয়ালঝুরি খালের পূর্ব পার্শ্বে এর অবস্থান। ২৫ মার্চ থেকেই এলাকাটি দেশের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিলো। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হওয়ার কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে এটি একটি জমজমাট বাজার হিসেবে গড়ে ওঠেছিলো। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বাজারটি ছিলো একটি নিরাপদ আশ্রয়। এখানে এক স্বাধীনতা বিরোধী পাট ব্যবসায়ী ছিলো তার নাম মমতাজ উদ্দিন ওরফে মন্তা। সে রাজাকার বাহিনীকে প্ররোচিত করেছিলো বাজারটিতে আক্রমন করার জন্য।

হাজীগঞ্জ থানার কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু এই আক্রমণ ও গণহত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিলো। জাতির দুর্ভাগ্য এই দুস্কৃতিকারী পরবর্তী সময়ে হাজিগঞ্জ পৌর সভার কমিশনের হয়েছিলো। সরকার তার বিচারে অসমর্থ হলেও মহান আল্লাহর বিচার থেকে সে রেহাই পায়নি, কয়েক বছর পূর্বে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে রাজাকার কমান্ডার বাচ্চু মারা যায়।

সেদিন ছিল ১৯৭১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার। রঘুনাথপুর বাজারের সাপ্তহিক হাটবার। প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল মুক্তাঞ্চলের এ বাজারে। ভরা বর্ষায় চতুর্দিক থেকে নৌকাযোগে আসা ক্রেতা বিক্রেতায় বাজারটি পরিপূর্ণ। আনুমানিক বিকেল ৩টায় ৫০/৬০ জন রাজাকার ছইওয়ালা ৬/৭টি নৌকায় করে বাজারের পূর্ব দক্ষিন ও পশ্চিম দিক দিয়ে বাজারে প্রবেশ করে। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আঃ মতিন তখন ছিলেন বাজারের পূর্ব উত্তর কোনের বগীরমার বাড়ী হিসেবে পরিচিত দিঘির পাড়ে একটি নৌকায়। বাড়িটির পাশের একটি অন্য নৌকাতে ছিলো তার সাথী মুক্তিসেনারা।

মুক্তিসেনাদের মধ্যে আঃ মতিন প্রথম রাজাকারদের আগমন টের পান এবং এলএমজি তাক করেন আক্রমন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার সহযোগীরা বাজারের হাজার হাজার লোকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশংকায় তাকে গুলি ছুড়তে বারণ করে। এ সময় রাজাকারদের পূর্ব নিয়োজিত দালাল মন্তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী রাজাকার বাহিনী পরিকল্পিতভাবে আক্রমন করে তারা প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধা আঃ মতিনকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের অপরেশনের প্রথম বাধা দুর হয়। তারপর রাজাকাররা ফাকা গুলি চালিয়ে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বাজারের অপ্রস্তুত লোকজন গুলির আওয়াজে জ্ঞানশূন্য হয়ে বিভিন্ন দিকে পালাতে শুরু করে। বাজারের মধ্যবর্তী বোয়ালঝুরী খালের ওপরে বর্তমান ব্রীজটির প্রায় ২০০ গজ উত্তরে ছিল কাঠের পুল। বর্তমানে সেখানে একটি পাকা ব্রীজ নির্মিত হয়েছে।

কাঠের পুলের পূর্ব পাড়ে পাটের ব্যবসায়ী রাজাকার মন্তা রাইফেল হাতে সহযোগী রাজাকারদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে দেখে পাট মাপার কাজে নিয়োজিত তারাপাল্লা গ্রামের সাহসী যুবক সামছুল হক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সে দৌড়ে গিয়ে রাজাকার মন্তার সামনে এসে দাড়িয়ে বললো ,''মন্তা তুই এ বাজারের লোক হয়ে কিভাবে বাজার আক্রমন করতে আসলি !!। এ নিয়ে রাজাকার মন্তার সাথে সামছুল হকের বাক-বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে উত্তেজিত সামছুল হক মন্তাকে ঝাপটে ধরে খালের পানিতে পড়ে যায়। বর্বর রাজাকার বাহিনী এ সময় নিরিহ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। রাজাকররা চলো যাওয়ার

পর দেখা যায়, এদিক ওদিক প্রায় অর্ধশত লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নিহত সাধারন মানুষের অনেক লাশ তাদের আত্মীয় স্বজন সন্ধ্যার পর সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রায় অর্ধ শতাধিক লোক এ হত্যাকন্ডে শহীদ হন। আমরা এ পর্যন্ত শহীদদের যে তালিকা পেয়েছি তারা হচ্ছে ঃ ১। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আঃ মতিন গ্রাম রাজাপুর থানা শাহরাস্তি ২। শহীদসামছুল হক পিতা শহীদ ওয়াহজউদ্দিন গ্রাম তারাপাল্লা থানা হাজীগঞ্জ ৩। শহীদ জুনাব আলী গ্রাম মহব্বতপুর থানা হাজীগঞ্জ ৪।

শহীদ নজরুল ইসলাম পিতা ছেরাজুল হক ভূঁইয়া গ্রাম মন্দিরবাগ থানা কচুয়া ৫। শহীদ প্রাণবল্লভ শীল গ্রাম রামপুর থানা হাজীগঞ্জ ৬। শহীদ আবদুল আউয়াল চৌধুরী পিতা বাদশা মিয়া চৌধুরী গ্রাম ধড্ডা থানা হাজীগঞ্জ৭। শহীদ গিরিশ চন্দ্র সরকার পিতা ইশ্বর চন্দ্র সরকার গ্রাম পরানপুর থানা কচুয়া ৮। শহীদ মোখলেছুর রহমান পিতা মনু মিঞা গ্রাম ওড়পুর থানা হাজীগঞ্জ ৯। শহীদ আবুদর রব পিতা মৃত ইছহাক মুন্সী গ্রাম ওরপুর থানা হাজীগঞ্জ

১০। শহীদ জাহানারা বেগম (বয়স ৮ বছর) পিতা মৃত আঃ মালেক গ্রাম দেবীপুর থানা কচুয়া। অন্যানদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা আঃ মতিনের লাশ রাজাকাররা দড়ি দিয়ে নৌকার পেছনে বেঁধে হাজিগঞ্জ বাজারে নিয়ে যায়। হাজিগঞ্জ বাজারে প্রকাশ্য স্থানে লটকিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। দু'দিন ধরে প্রকাশ্যে জনসাধারণের দর্শনের জন্যে ঝুলিয়ে রাখে।

স্বাধীনতার পর প্রথম দু একবছর রঘুনাথপুর গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে পরে তা বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যেতে বসেছিলো। জনগন অনেক কিছুর মতো এই নারকীয় ঘটনা ভুলে যেতে বসেছিলো। নব্য প্রজন্ম জানতে পারবে না তাদের স্বজনদের আত্ম ত্যাগের কথা, এই চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে।

বিজয়ের পঁচিশ বছর পর ১৯৯৬ সনে হাজিগঞ্জথানার তারাপল্লা গ্রামের সন্তান চাঁদপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক বীরমুক্তিযোদ্ধা সর্দার আবুল বাশারের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতি সংসদ নামে একটি সংসদ গড়ে তোলা হয়। রঘুনাথপুর বাজারে বর্তমানে সংসদের একটিদ দপ্তর রয়েছে। ২০০৬ সনের আট মার্চ লেখক এবং দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠের সম্পাদক যৌথভাবে দপ্তরটি উদ্বোধন করেন।

স্মৃতি সংসদ শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতির মিনার নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। যাতে রঘুনাথপুর গণহত্যার কথা মানুষ স্মরণ রাখে। শিল্পী স্বপন আর্চায স্মৃতির মিনারের নক্সা প্রণয়ন করেছেন। ১৯৯৭ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী চাঁদপুর জেলা প্রশাসক খালিদ আনোয়ার স্মৃতি সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এরি মধ্যে আরো নয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু প্রস্তাবিত স্বপ্নের সে স্মৃতিসৌধ আজো নির্মিত হয়নি। জনগনের প্রাণের দাবী একটি স্মৃতি সৌধ নির্মান করা। কিন্তু কবে বাস্তবায়িত হবে সে দাবী সেটাই প্রশ্ন ? তারপরও সর্দার আবুল বাশার ও তার সহযোদ্ধারা তৎপর রয়েছেন একটি স্মৃতি সৌধ গড়ার জন্যে।

চার. লাওকরা যুদ্ধ ও গণহত্যা চলতি ভাষায় লাকমারা (২৩.১০.৭১)

গণহত্যার আর একটি ঘটনা ঘটে লাওকরা গ্রামে। তবে পাকসেনারা এখানে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মুক্তিযোদ্ধরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। এ যুদ্ধে বাঙালী মুক্তিসেনারা দু'জন যোদ্ধাকে হারিয়েছেন তারা হচ্ছেন শহীদ মোঃ জহির হোসেন, পিতা-মৃত মৌলভী মোঃ ছালামত উল্লাহ সাং - শমেসপুর এবং শহীদ মোঃ ইলিয়াছ হোসেন পিতা- মৃত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক সাং আজাগরা শাহরাস্তি। যুদ্ধে পাকাসেনাবহিনীর একজন ল্যাফটেন্ট পদমর্যাদার অফিসারসহ ২৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। লাওকরা যুদ্ধের ভয়াবহতা ঐ এলাকার জনগণ এখনও ভুলেনি।

২৩.১০.৭১ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত থেমে থেমে সারাদিন যুদ্ধ হয়েছিলো। মুক্তিসেনাদের অবস্থান ছিল লাওকরা মজুমদার বাড়িতে। এই সংবাদ পাকবাহিনীকে স্থানীয় এক দালাল জানিয়েছিল। বাড়ির পূর্ব দিকে রয়েছে একটি ছোট্ট খাল। এটি ঐতিহাসিক শৈল খালী খালের সাথে সংযুক্ত। পাকবাহিনী যাতে সরাসরি বাড়িতে প্রবশ করতে না পারে সে জন্য মুক্তিসেনারা বাঁশের সাকোঁটি ভেঙ্গে ফেলে ছিলো। উয়ারুক থেকে পাকবাহিনী দুই ভাগ হয়ে যায় এক ভাগ পায়ে হেঁটে এবং অপরভাগ নৌকায় করে আসে। পাকবাহিনীর সাথে ছিলো ১০০ সদস্যের দেশীয় রাজাকার বাহিনী। তারা সাথে করে এনে ছিলো অত্যাধুনিক অস্ত্র সস্ত্র যুদ্ধ স্থলে ঘুমিয়ে আছে একজন অলি আল্লাহ।

পাকসেনাদের আগমনের খবর শুনে খুব ভোরে মুক্তিসেনারা মজুমদার বাড়ির খাল পাড়ের বাঁশ ঝাড়ের নীচে এবং পাশ্ববর্তী বাগানে এম্বুশ করে বসে থাকে। পাকবাহিনী এসেই অতর্কিত হামলা করে। তাদের অর্তকিত হামলার মুখে মুক্তিসেনাদের এলএমজি ম্যান আবদুল হাকিম মোল্লা ভয় পেয়ে যায়। সে হঠাৎ তার সামনে পাকবাহিনী দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভয়ে আতঙ্কে সে এলএমজি ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে পিছেনে চলে আসে। যা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি।

এই পরিস্থিতিতে ওপর মুক্তিসেনা আবুল খায়ের (উল্কা) বীরত্বের পরিচয় দেয়। সে যখন দেখল লড়াইয়ের আসল হল এলএমজি ম্যান কিন্তু তিনি লড়াই না করে পিছনে এসেছেন। তার ফিরে আসা মানে সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। আবুল খায়ের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিৎকার দিয়ে সবাইকে কমান্ড করলো ফায়ার। তার কমান্ডে সবাই পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিসেনা আর পাকবাহিনীর মাঝে পঞ্চাশ হাতের ব্যবধানও নেই। সেদিন খায়ের সাহস করে কমান্ড না দিলে তার গ্রুপের সবাইকে জীবন দিতে হতো।

প্রচন্ড সাহস নিয়ে যুদ্ধে করে গুলিবিদ্ধ হয়ে সম্মুখ সমরে আত্মাহুতি দেন দুই মুক্তিসেনা। জহিরও ইলিয়াস যুদ্ধের পর এদের সমাহিতত করা হয় নাসিরকোর্ট কলেজ প্রঙ্গানে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে টিকে থাকতে না পেরে পাক দস্যুরা চতুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিসেনারা ঝোপঝাড়ে, জঙ্গালে, পানিতে দাঁড়িয়ে যে যেভাবে পারছে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়তে গিয়ে দু'জন বীর যোদ্ধা শহীদ হলেও সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করে ২৫ জন পাকসেনাকে হত্যা করা সম্ভব হয়। ২ মার্চ ২০০৬ লেখক কথা বলেন যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী একশত পনর বছর বয়সী গ্রাম্য কবিরাজ আঃ আজিজের সাথে। হযরত আলেক শাহের মাজার সংলগ্ন চায়ের দোকানে আলাপের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত

সরকারী কর্মকর্তা আঃ মান্নান তার বর্তমান বয়স ৮২ বছর। তারা দু'জনই ঘটনার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। আঃ আজীজ পিতা নসর উদ্দিন পাক সেনাদের পঁচিশটি লাশ সরিয়ে নেওয়ার কাজে বাধ্য হয়ে সাহায্য করেছিলেন।

বৃদ্ধ আঃ আজীজ বলেন মুক্তিসেনাদের মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী কয়েকটি লাশ রেখে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী ফিরে যাবার সময় লাওকরা মজুমদার বাড়ীর প্রায় সব কয়টি বশতঘর ও পাকের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। যুদ্ধে হেরে প্রতিহিংসায় যাকে সম্মুখে পায় তাকেই হত্যা করে। যে সমস্ত বেসামরিক লোক মারা নিহত হন তাদের মধ্যে নিম্ন বর্ণিতদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ঃ ১। জয়নাল আবেদীন মজুমদার (৫৫) ২। ইয়ছিন মজুমদার পাটওয়ারী (৫৫) ৩। সৈয়দ আবদুল বাতেন (২৮) ৪। সৈয়দ আবু তাহের (১৬) ৫। হাফিজউদ্দিন পাটওয়ারী (৫৫) ৬। আমির হোসেন পাটওয়ারী (৪০) ৭। চাঁদমিয়া পাটওয়ারী (৩০) ৮। চাঁদমিয়া বেপারী (৪৩) ৯। ছিদ্দিকুর রহমান সরদার (৪৫) ১০। সোনা মিয়া (৭৫) ১১। ফাতেমা (৫৬) ১২। রাহেলা খাতুন (৪৫) ১৩। সৈয়দ মোস্তফা কামাল (২৫) গ্রাম লালাবাগ থানা কোতওয়ালী জেলা কুমিল্লা ১৪। হুমায়ুন কবির (১৮) গ্রাম চাপাতলী থানা কচুয়া ১৫। ফোরকান (১৫) গ্রাম দেবকরা থানা শাহরাস্তি।

এই যুদ্ধে লাওকরা গ্রামের যারা আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে জুনাব আালী মজুমদার, হাফিজ উদ্দিন, রহিমা খাতুন রেজিয়া খাতুন, তবদিল হোসেন, তাজুল ইসলাম আবদুর রহিম বেপারী এখনও বেঁচে আছেন। লেখক লাওকরা ভ্রমনকালে ঐ গ্রামের কৃতি সন্তান পুরানবাজার চাঁদপুর কলেজের অধ্যক্ষ তরিকউল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। লেখককে তথ্য সংগ্রহ করার কাজে তিনি ও হাটিলা (পুর্ব) ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আঃ মান্নান সর্বোতভাবে সাহায্য করেন।

লাওকরা যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বর্ণনা দিয়ে আঃ আজিজ লেখককে বলেন, ''যুদ্ধের বিভিষীকা এখনও আমাকে তাড়া করে। মজুমদার বাড়ি ও আশেপাশের বাড়ীর অফুরন্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারপরেও এলাকার জনগন যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তা চিরদিন স্মরণ থাকবে। গৌরবের সাথে গর্বের সাথে আমি আমার জীবনের বাকী সময় ঘটনার বর্ণনা দেবো। লেখকের মনে হলো এই বৃদ্ধের অনুভূতির মাঝেই মুক্তিসেনাদের আত্মত্যাগ সার্থক হয়ে রয়েছে।

একজন নারীমুক্তিযোদ্ধা ও অফিস চিতোষীর ধর্ষিতা ১২জন বাঙ্গালীযুবতীঃ

১৯৭১ সনে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত দু'জন তরুন তরুনী ঘর বেধেঁছিল পুর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরে। একজন পেশায় আইনের ছাত্র অন্যজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের। সদ্য ঘর বাধঁলেও তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে দেশের ঘটনা প্রবাহের ওপর। ২৫মার্চের কালো রাতে তারা প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থান করছিলেন, সে রাতে ইতিহাসের সবচাইতে নিকৃষ্টতম গণহত্যার ঘটনাটি ঘটে।

সে সময় পচিঁশলক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা নগরীর একটি ঘর বাড়িও অবশিষ্ট ছিলোনা যেখানে পাকহানাদার বাহিনীর সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করেনি ; লুন্ঠন করেনি ধর্ষন করেনি। নির্যাতনের জন্যে বিভিন্ন ছাত্রী নিবাস ও হল থেকে বাঙ্গালী নারীদের সেনা নিবাস সমুহে নিয়ে গিয়েছিলো। নির্যাতন করে হত্যা করে ছিলো অসংখ্য মা বোনকে।

২৭ মার্চ তরুন ছাত্রনেতা তফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তার সদ্য বিবাহিত তরুনী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডাঃ বদরুন্নাহার কে নিয়ে অবরুদ্ধ ঢাকা শহর ছাড়েন। ঢাকা তখন স্বাধীন বাংলা দেশের নতুন রাজধানী। পুরো শহর দখল করে আছে পাকিস্তানী সৈন্যরা ওদের তাড়াতে হবে, মুক্ত করতে হবে বাংলা দেশের ভৌগলিক সীমানার হানাদার কবলিত প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি। বদরুন্নাহার স্বামীর হাত ধরে স্বামীর বাড়িতে চলে আসেন। যোগাযোগ করেন সদ্য গঠিত পাঠান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জহিরুল হক পাঠানের সাথে।

স্বামীর হাত ধরেই বদরুন্নাহার স্বাধীনতা যুদ্ধের উষালগ্নে ঘর ছেড়ে সক্রিয় ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে লেখক ছিলেন তাদেঁর রনাঙ্গনের সহযোদ্ধা। উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষনের জন্যে লেখক দেশ ছাড়েন ২৩ শে জুন ৭১। তখন বদরুন্নাহার পাঠান বাহিনীর মেডিকেল অফিসার। আহত সেনাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া তার মহান দায়িত্ব। গজ, ব্যান্ডেজ, চেতনা নিরোধক ঔষদ ছাড়াই অস্ত্রপচার করেছেন এই ছাত্রী ডাক্তার।

২৯ সেপ্টম্বর বুধবার ১৯৭১। শরৎ কাল শেষ হতে চলেছে সাথে সাথে আশ্বিন মাসও। পাঠান বাহিনীর জন্যে আজ এক আগ্নি পরীক্ষা। অধিনায়ক জহিরুল হক পাঠন জানতে পেরেছেন পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা অফিস চিতোষীতে অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে বিশ/পঁচিশ জন বাঙ্গালী তরুনীকে আটকে রেখেছে। তাদের ওপর প্রতিনিয়ত চলছে অমানবিক পাশবিক নির্যাতন খবর পেয়ে পাঠান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ওঠলো।

সহযোদ্ধাদের মনোভাব বুঝতে পেরে পাঠান সিদ্ধান্ত নিলেন জীবন পাত করে হলেও ওদের উদ্ধার করা হবে এবং পাকহানাদার বাহিনীর একটি সৈন্যকেও জীবিত ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। এতে যদি পাঠান বাহিনীর শেষ সৈন্যটিও শহীদ হয়। তা হলেও বোনদের উদ্ধার করে পাক সেনাদের চরম শিক্ষা দেওয়া হবে।

সেদিনভোর থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, মেয়েদের কান্নার সাথে তাল মিলিয়ে প্রকৃতিও কাদছিল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সেই সাথে হিমেল হাওয়া। আগাম শীতের আমেজ, হাড় কাঁপানো শীতই বলা যায়। বেশির ভাগ মানুষ ঘরে জড়ো সড়ো হয়ে আছে। পাক সৈন্যরা স্ফুর্তিতে আছে, চরম নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে

ওদের। কিন্তু ওরা জানতোনা ওদের জন্যে কি নির্মম পরিনতি অপেক্ষা করছে। মদ নারী ও লুন্ঠনে ওরা তখন ছিলো মাতোয়ারা।

১৯৭১ সনের প্রতিটি যুদ্ধের মাঠে রাইফেলের চেয়ে নারী ওদের কাছে অধিকতর প্রিয় ছিলো। পাক সেনাদের অসর্তক মুহূর্তে সকাল সাতটার সময় মুক্তিসেনারা ঘিরে ফেলে পাকসেনাদের ক্যাম্প। প্রচন্ড যুদ্ধে চলে আট চল্লিশ ঘন্টা ধরে। সুযোগ্য কমান্ডার জহিরুল হক পাঠান সুবেদার আঃ রব প্রমুখের নেতৃত্বে একদিকে মুক্তিপাগল বাংলামায়ের দামাল ছেলেরা অন্য দিকে হানাদার কাপুরুষ বর্বর পাকসেনারা।

তিনদিনের মরণপর যুদ্ধের পর, শতাধিক পাকিস্তানী সৈন্যের লাশ ফেলে ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় পাকিস্তানীরা পালিয়ে যায়। সুলতান ভূইয়া নামক জনৈক লোকের ঘর পাওয়া যায় মৃত প্রায় ১২ জন যুবতীকে। তাদের সবাইকে উলঙ্গ করে রাখা হয়েছিলো যাতে পালাতে না পারে। এই বাঙ্গালী নারীদের শরীরে এমন কোন স্থান ছিলোনা যেখানে পাক সেনাদের বিষাক্ত নঁখ বা দাতেঁর দাগ নেই। মেয়ে গুলো ছিলো তৎকালিন ফরিদপুরের জেলার ঘোষের হাট এলাকার বাসিন্দা। ভারতে যাওয়ার পথে এদেশীয় দালালদের দেয়া তত্যে ওদের পরিবার পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়ে বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুদের পাক সেনারা হত্যা করে। লাঞ্চিত বোনদের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। অধিনায়ক জহিরুল হক পাঠানের নির্দেশে উদ্ধার প্রাপ্ত দারুন অসুস্থ্য তরুণীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়। যুদ্ধের ময়দানে অধিনায়ক চিন্তায় পড়লেন, মৃত প্রায় লাঞ্চিত মেয়ে গুলোকে কি করে বাঁচাবেন, কোথায় রাখবেন। সে সময় এগিয়ে এলেন একজন তাদের মহিয়সী নারী । বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ বদরুন্নাহার ১২জন লাঞ্চিত বোনের দায়িত্ব গ্রহন করলেন।

রাত দিন তার সেবা কার্যক্রম চলতে থাকলো। একজন মেধাবী ডাক্তারের সেবা ও চিকিৎসায় প্রান ফিরে পায় ১২ জনক নির্যাতিত নারী। অপ্রতুল ঔষধ ও হাসপাতাল সুবিধা বিহীন অবস্থায় একজন ছাত্রী ডাক্তার এক অসাধ্য সাধন করলেন। মেয়েদের উদ্ধার ও নিরাপদে স্বজনদের কাছে পৌছে দেওয়া চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এই একটি ঘটনার জন্যেই জহিরুল হক পাঠান তার সহযোদ্ধারা এবং ডাঃ বদরুন্নাহার চাঁদপুর জেলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে একজন বীর মুক্তিসেনা কমান্ডারের কথা পুনরায় লেখক শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চান তিনি হচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার (অবঃ) আঃ রব। চাঁদপুর শহরের রাস্তায় যখনই তার সাথে লেখকের দেখা তখনই তার মনে পড়ে অফিস চিতোষীর যুদ্ধে কথা। সুবেদার আব্দুর রব তখন ছিলেন জহিরুল হক পাঠানের শক্তির আধার। প্রচন্ড ক্ষীপ্রতায় সুবেদর রব সেদিন অসম যুদ্ধে লড়ে তার বাহিনীকে সম্মানজনক জয় এনে দিয়েছিলেন। সুবেদার রব, নায়েব সুবেদার গফুর, নায়েব সুবেদার সাত্তার (হারিস ওস্তাদ) এদের কথা হয়তো কোন ইতিহাস লেখক লিখবেন না। তবুও জাতির প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির চিন্তা না করেই এরা লড়েছেন। বাংলার মুক্তি পাগল এই সন্তানরা যুগে যুগে বাংলার আকাশ বাতাসে মিশে থাকবেন।

সুপ্রিয় পাঠক একাত্তরের ষোল ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলো বটে কিন্তু লুক্কায়িত শত্রুদের প্রতিহিংসার আগুন প্রশমিত হলোনা। তাদের নখ দাঁত কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে রইলো। বাহাত্তর সালের মধ্য ভাগ থেকেই দেশের নব্য ধানিক শ্রেনীর অভ্যুদয় দৃশ্যমান হয়ে ওঠলো, লুক্কায়িত রাজাকার আলবদররা তাদের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিয়ে নব্য ধনিক শ্রেনীর সাথে মিলেমিশে এককার হয়ে গেলো।

মুক্তিযুদ্ধের মুল্যবোধের অবক্ষয় আর ঠেকানো গেলোনা। নতুন শাসক গোষ্ঠি ও হানাদারদের এদেশিয় দোসররা আত্মীয়তা জড়িয়ে নতুন একধারায় জন্ম দিলো। সে স্রোত ধারায় জন্ম নেয়া নব প্রজন্ম এখন বাংলা দেশের মানচিত্র আজ চিবিয়ে খেতে বসেছে । মুক্তিযোদ্ধারা অপাংতেয় হয়ে গোলো। স্বাধীনতার ক্ষকাল পরেই ষড়যন্ত্র করে তাদের হাইজ্যাকার খুনী, পথভ্রান্তত যুব শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিলো।

সাধারণ ক্ষমা ও একাত্তর পুববর্তী অবস্থায় প্রত্যাবর্তনঃ

বাঙ্গালীর সর্বকালের কলংক ১৯৭১সনের ষোল ডিসেম্বর অন্তঃহীন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের। উৎসাহ দীর্ঘমেয়াদী হলো না। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর একটি আকস্মিক সরকারী ঘোষাণায় দালাল আইনে তখন পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সকল আটক ব্যক্তির প্রতি সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করা হলো।

ইতপূর্বেকার সমস্ত ওয়াদা, জনসভায় ক্রন্দন, মানব সমাজ ও ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকার ভীতি প্রকাশ করে দেয়া বক্তব্য প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি বিস্মৃতি হয়ে শেখ মুজিবর রহমান ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নির্দেশ দেন, যেন এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত দালালকে ছেড়ে দেয়া হয়, যাতে তারা দেশের তৃতীয় বিজয় দিবস পালনের উৎসবে শরীক হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দালালাদের দেশ গড়ার কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু বাস্তব রূপ ভিন্ন হলোম, কাঠাল গাছে আমা ফলে না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই মালেক মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্তকারী দালালসহ মুল স্বাধীনতা বিরোধীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসলো। শেখ মুজিব বুঝতেও পারলেন না, জাতীর কি ভয়ংকর ক্ষতি তিনি করলেন। বাঙ্গালী জাতির অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ঘোষণার মাত্র এক বছর নয় মাস সময়ের মধ্যে তিনি সপরিবারে ঘাতকদের হাতে প্রান হারালেন।

স্বাধীনতার প্রাণ পুরুষ শেখ মুজবুর রহমান ইতিহাস হয়ে গেলেন। তার আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুমন্ত্রনা দানকারী অপশক্তি সমুহ এবার স্বমুর্ততে আবিভূর্ত হলো। তারা তাদের নেতার লাশ ফেলেই নতুন সরকারে কাজ করার শপথ নিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গাবন্ধু হয়ে ও বুঝতে পারলেন না ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা।

ইতিহাসের অমোঘ সত্য কেউ তার শিকার না হওয়ার আগে বুঝতে পারে না। বাঙালীর অপর প্রাণ পুরুষ, বিপদঙ্কালীন সময়ে কান্ডারী সফল সেনানায়ক , মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ও একই ভুল করলেন, ফল শ্রুতিতে যখন তার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল তখনই অর্থাৎ ৩০ মে প্রাণ হারালেন।

বাঙ্গালী জাতির জন্য এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলি সরকার গঠিত হয়েছে, প্রত্যেকে একাত্তরের ঘাতকদের পুনর্বাসনের জন্য কম বেশী দায়ী। শেখ মুজিবর রহমান ঘাতক ও দালালদের বিচার না করে ক্ষমা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাদের রাজনীতি করার আধিকার দিয়ে, নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৭২ সনের সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার সহ পরবর্তী ৩৫ বছরের প্রতিটি সরকার নিজেদের গদিরক্ষা ও ব্যাক্তি স্বার্থে স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে সু সর্ম্পক বজায় রেখেছেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের করেছেন চরম অবজ্ঞা। এমনিকরে জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধ ও এর প্রাপ্তি অপাংতেয় হয়ে গেল লক্ষ প্রাণ আর রক্ত স্রোতে অর্জিত স্বাধীন ভূমিতে। ২৬ শে মার্চ , ১৬ ডিসেম্বর এখন শুধুই আনুষ্ঠানিক আন্তরীকতা নয়।

গণহত্যাকারীদের বিচার বর্তমানে সম্ভব কিনা ?

প্রতীকি হলেও স্বাধীনতা বিরোধী খুনিদের বিচার হওয়া একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। বেইমানদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি হওয়া দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাকান্ড বিশেষ করে জার্মান নাৎসী বাহিনী কর্তৃক লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদী কমিউনিষ্ট এবং অ-জার্মান নাগরিকদের ঠান্ডা মাথায় নির্মমভাবে হত্যার পর বিশ্ব বিবেক এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে। যুদ্ধ-পরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহাযুদ্ধ অবসানের পর থেকে যে তৎপরতা শুরু হয়েছে ৬০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসময় বিপুল সংখ্যক নাৎসী যুদ্ধের পর গোপনে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্র পুর্ববতী সময়ে যুদ্ধের অপরাধে অভিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কুট ওয়াইর্ল্ডহেইমকে ঢুকতে দেয়ার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয়েছে। সেখানকার সরকার উপেক্ষা করতে পারেনি জনদাবী।

কারাগারের অভ্যন্তরে নেয়া হয়েছে নাৎসী নেতা হেসকে। এই কয়েক বছর আগেও ধরে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সেই সব ঘাতকদের। ১১/৫/৮৭ ফ্রান্সের এক আদালত বিচার হয়েছে সাবেক গেষ্টাপো প্রধান ক্লাস বারবির। কিন্তু আমাদের দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি একমাত্র রাজাকার চিক্কন আলী ছাড়া।

দেশদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতকদের বিচারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হচ্ছি আমরা। মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকান্ড যারা ঘটিয়েছিল এবং যারা তাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল তাদের বিনা বিচারে কিম্বা বিচারের প্রহসন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ক্ষমা করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে তাদের। লক্ষ লক্ষ শহীদের স্বজনরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন শেখ মুজিবুর রহমান থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা সরকারে ছিলেন এবং আছেন-কে তাঁদের আধিকার দিয়েছিল ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের সঙ্গে এই বেইনসাফী করার ? শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার আজ যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে শহীদদের মাতা পিতা স্বজন যখন কাঁদতে কাঁদতে চোখের অশ্রু শেষ করে ফেলে তখন শাসকক গোষ্ঠির বিবেক কি করে জানতে বড় স্বাদহয়।

যারা যুদ্ধে কিছুই হারাননি বরনঞ্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের উপকার ভোগী হিসাবে কল্পনাতীত সুখ, সম্পদ, ক্ষমতা পেয়েছেন তারাতো দালালদের তোষন করবেনই এতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধে অজ্ঞাতনামা শহীদ এবং আমাদেরই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। স্বাধীনতার স্বাদ তাঁরা আমাদের এনে দিয়েছেন। তাঁদের রক্তের ঋণে আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধর চির আবদ্ধ। কিন্তু তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি। বিচারের তেমন কোন উদ্যোগ ও নেওয়া হয়নি।

অথচ তাঁদের পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করে আমরা কি চরম বিবেকহীনতার পরিচয় দিচ্ছি না ? ইতিহাসের যে কোন বিপ্লব যে কোন জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে অধিক রক্তস্নাত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই গৌরবজ্জল অধ্যায়ের চেতনাই কি হওয়া উচিত নয় আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ঠীয় সকল মহৎ প্রয়াসের অনুপ্রেণার মুল উৎস ? আগামী দিনের ইতিহাস অবশ্যই আমাদের কর্মের যথাপোযুক্ত মুল্যায়ন করবে। সেই পবিত্র শহীদানের প্রমাণিত হত্যাকারীরা আমাদের আরও স্বজনের রক্তপানের জন্যেই চোখের সামনে আজ আবারও ছুরি শানাচ্ছে অথচ আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ এমনই কাপুরুষ যে ভ্রাতৃ হত্যাকরীদের পরিচয় উদঘাটনের সাহসও আমাদের নেই।

আমরাও কি একইভাবে সেই শহীদদের কাছে দায়ী হয়ে থাকবো ? স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানার অধিকার নব প্রজন্মের আছে। যদি তাদের সত্যিকার ইতিহাস জানতে দেওয়া হয় তাহলে তারা উজ্জীবিত হবে এই কথা ভেবে তাদের পূর্ব পুরুষগণ লড়েছেন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে; প্রথমদিকে খালি হাতে পরে তাদের সম্বল বলতে ছিল শুধু পুরোনো আমলের থ্রিনট থ্রি রাইফেল আর সামান্য কিছু গোলা বারুদ।

চাঁদপুর জেলার লাওকরার মতো হাজারো স্থানে বাংলার সাহসী সন্তানরা আত্মসমর্পণ করেননি। শক্তিশালী পাক সেনাবাহিনীও –রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অসাধারন সাহস দেখিয়েছিলেন গুটিকয়েক সাহসী যুবক। হত্যা লুটপাট ধর্ষণ আর রক্ত স্রোত। নিপীড়িতের আকাশ বাতাস কাঁপানো আর্তনাদ। আহতের আর্তচিৎকার। মহাকালের বিশাল অংশ জুড়ে নিজের গর্ভে মানবিকতার নির্লজ্জ অপমানের অনেক কথা নিজ বক্ষে ধারণ করে রেখেছে ইতিহাস। চাঁদপুর জেলার কাশিমপুর, ছোট সুন্দর, লাওকরা ও রঘুনাথপুর গণহত্যা দেশের অসংখ্য গণহত্যার মতোই বর্তমানে ইতিহাসের অংশ। এই ইতিহাস গৌরবের।

অনাগত কালে গর্বকরার মতো। আমাদের নব প্রজন্ম কখনো ভুলবে না ভুলতে পারেনা। ১৯৭১ সনে পাকিস্তনীরা বাঙ্গালীদের পদদলিতে করতে উন্মত্ত পশুর মতো হামলা করেছিলো। বাংলার পবিত্র ভুমিতে কৃতকর্শের জবাব তারা অবশ্যই পেয়েছে, শুধু বিচার হয়নি এদেশীয় রাজাকার আলবদরদের। তাই চাঁদপুরে এই স্থান গুলো এখনও কান্না করে কেঁদে বলে ইতিহাস তুমি কেদোঁনা আমার কান্নার ফাঁকে সাহসী সন্তানদের বীরত্ব গাথাঁও আছে।

সুপ্রিয় পাঠক স্বাধীন দেশের মাটিতে অর্জিত বিজয়ের তিন যুগ পরেও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির দাপটে চাঁদপুরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা বন্ধ দিতে হয়েছে। আমরা রাজাকারদের সাথে একই আলোচনার টেবিলে বসে ঠিক করছি ২৬মার্চ জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস কেমন করে অনুষ্ঠিত হবে। আজ স্বাধীনতা দিবস অথবা বিজয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত আলোচনার আসরে অপাংতেয় হয়ে মুক্তি যোদ্ধারা বসে থাকে রাজাকার প্রতিনিধি উচ্চকণ্ঠে কথা বলে।

আমার ও আমার সাথীদের রক্ত ঘামেই কেনা দেশের প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাকে বিনা কারণে ধীক্কার দেয় সমীহ করে রাজাকারের কথা শোনে, পালনে জীবন পাত করে। বিশ্বের ইতিহাসে গণহত্যা পরিচালনাকারী দালালদের এভাবে 'ক্ষমা' করে দিয়ে জনসমাজে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়ার অপর কোন নজীর রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের জানা নেই কোন দেশ স্বাধীনতার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই স্বাধীনতাবিরোধীদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। বিশ্ব জুরী পরিষদ আজও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের আজও তাদের দেশে ভোট দানের ক্ষমত দেওয়া হয়নি। অনেক নাৎসী যুদ্ধাপরাধীর কঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সত্যিসত্যিই তা কথিত যুদ্ধাপরাধীর কঙ্কাল কিনা? নিশ্চিত হওয়ার জন্য কারন বেঁচে থাকলে তাদের নিশ্চয়ই বিচার হত।

গণহত্যাকারীদের বিচারের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবসমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধের সুবিচার এবং এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্যই এই ব্যবস্থা। আমার স্বদেশ আর কতদিন ধৈর্যের পরীক্ষা দেবে ? কত দিন মুক্তিসেনাদের পবিত্র আত্মা কষ্ট পেতে থাকবে ? কাকে প্রশ্ন করবে মুক্তি যোদ্ধাদের নব

প্রজন্ম? যে কথা লেখকেরও জানা নেই। তবে তিনি নিশ্চিত মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধদের অপমান , অবহেলা অবমুল্যানের জন্যে জাতির নব প্রজন্ম এদের ক্ষমা করবে না।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না দালাল বুদ্ধিজীবীদের মতো দালাল আমালাদের একটি বড় অংশ এখনো সরকারের প্রশাসনে কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন সামাজিভাবে নিজেদের পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজেদের নব প্রজন্মবে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছেন।

তা হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কী সত্যিকার অর্থেই ব্যর্থ হয়ে গেলো? লেখক আশায় বুক বেঁধে আছেন তার সাথীদের পবিত্র রক্ত স্রোত একদিন অবশ্যই কথা বলা শুরু করবে। জমা দেওয়া অস্ত্র আবারও স্বক্রিয় হবে তার নব প্রজন্ম লড়বে আরো বহু মুক্তিযুদ্ধ। যখন সমাজে অনাচার অত্যাচার বাড়বে তখনই প্রত্যাঘাত হানার জন্যে মুক্তি যোদ্ধাদের নব প্রজন্ম জন্ম লাভ করবে। কাশিমপুর , ছোট সুন্দর , লাওকরা, রঘুনাথপুরের শহীদদের আত্মা বহুদিন পর তাদের নব প্রজন্মের মুক্তির লড়াইয়ে শামিল হবে।

চাঁদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গণ

পদ্মা,মেঘনা, ডাকাতিয়া বিধৌত অববাহিকায় পলি বালিতে গড়া সাংস্কৃতিক নগরী আমাদের প্রিয় চাঁদপুর।চাঁদপুর আমার মা,চাঁদপুর আমার ভালবাসা, এই চাঁদপুরের মাটিতে জন্ম নিয়ে আমি ধন্য। আমার সংগীত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত তবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি এর ব্যপ্তি । জীবনের পরিপূর্ণতার সাথে সংগীতের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হচ্ছে সংগীত। দেশে ও বিদেশে এর উজ্জ্বল সম্প্রসারণ বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''গীতাঞ্জলীর"(১৯১৩) নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি বাংলা গানের উৎকৃষ্টতা প্রমান করে। হরিণা চালিতাতলীর ঘোষাল পরিবারের সূর্য সন্তান যিনি একাধারে অভিনেতা, নির্দেশক,যন্ত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক প্রয়াত উমানাথ ঘোষালের অবদান যাত্রা ও বাংলা গানে অবিস্মণীয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উমানাথ ঘোষাল লেখকের ঠাকুর দাদা। চালিতাতলীর আরেক প্রান পুরুষ সংগীতজ্ঞ প্রয়াত রেবতী ঘোষাল (লেখকের বাবা) সংগীতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদেরকে স্মরণ করি। চালিতাতলির আরেক মহান পুরুষ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেব (সওগাত পত্রিকার সম্পাদক) ও নূরজাহান বেগম (বেগম পত্রিকার সম্পাদক) এরা 'দু'জনেই সাহিত্যে অবদান রেখে গেছেন।

স্বাধীনতার পুর্বে যারা সংগীতে নাটকে, নৃত্যে, চিত্রকলায় ও সাংবাদিকতায় অবদান রেখে গেছেন তাদের নামগুলো চাঁদপুরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের জেনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রয়াত নগেন্দ্র চন্দ্র দে(নগা দা) নগেশ চক্রবর্তী, বিলাশ চক্রবর্তী, ভানু মজুমদার, ভরত সাহা, ফনীন্দ্র চন্দ্র পাল, পরান মল্লিক, কালু মহলা নবিশ, মরু ঘোষাল,গোবিন্দ মালাকার, দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তী, মন্টু মজুমদার, হিমাংশু চৌধুরী,শৈলেন্দ্রনাথ রায়, নান্নু মিয়া, শামসুদ্দীন আহমেদ, ডাঃ নুরুর রহমান, প্রদীপ দে, বিমল কর, বেলায়েত হোসেন, মনিরুল ইসলাম, হাশেম খান, শ্যামল সেন, দেবদাস ভৌমিক, মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, শেফালী সরকার, মোসলেউদ্দিন, এমদাদ হোসেন, মোহাম্মদ হোসেন খান, জাহাঙ্গীর আখন্দ সেলিম, আব্দুল বাতেন, কামরুজ্জামান চৌধুরী, শংকর দে, তপন রায় চৌধুরী, বাচ্চু, চক্রবর্তী, তুষার কান্তি চক্রবর্তী, মন্টু চক্রবর্তী, কাল শশী চক্রবর্তী, মনু বসু, মনু ঘোষ প্রমুখ।

চলচিত্রে যারা নিজের অবস্থান করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালতী দে, কৃষ্ণা কাবেরী অঞ্জলী রহমান, ওয়াসিম, দিলদার, প্রদীপ দে, জহরত আরা ও শুভ্রা প্রমুখ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট অভিনেতা শরীফ চৌধুরী ও আবুল কালাম আজাদ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৭ সালের ১লা অক্টোবর সংগীত নিকেতনের জন্ম হয়। জন্মলগ্ন থেকে যারা প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত ছিলো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল সেনগুপ্ত, দেবদাস ভৌমিক, রাধা গোবিন্দ তুলাল, জীবন কানাই চক্রবর্তী, সুরেশ দাস ঝন্টু, তপন রায় চৌধুরী, দিলীপ দত্ত,অমল সেন, শীতল ঘোষাল, চম্পক সাহা প্রমুখ।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ১৩ই মার্চ বীর মুক্তিযোদ্ধা এডঃ আব্দুল মমিনখান মাখনের উদ্যোগও প্রচেষ্টায় সংগীত শিল্পী শীতল ঘোষাল ও চম্পক সাহার সহযোগীতায় গড়ে উঠেছে চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগীত শিক্ষালয় চাঁদপুর ললিতকলা। প্রতিষ্ঠালগ্নে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা হচ্ছেন, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ রায় (ঝ.ঘ.জঙণ), অজয় ভৌমিক, গনেশ কর্মকার, মিজানুর রহমান রতন, আবু নঈম পাটোওয়ারী দুলাল, শিবুকর রাধা গোবিন্দ ঘোষ, মুখলেসুর রহমান মুকুল, রফিকউল্লাহ, হর্ষওয়াস্তি, ভূলনদত্ত গুপ্ত, জাহাঙ্গীর আলম বেদন, এডঃ হারাধন সরকার, প্রফেসর ওবায়েদউল্লাহ, শান্তি রক্ষিত, সুরজিত চক্রবতী, আবুল কালাম আজাদ, প্রয়াত হরিপদ চন্দ, মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

স্বাধীনতার পরে অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের সাংগঠনিক জটিলতা ও নেতৃত্বের কারনে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এদের মধ্যে কম্পন সাংস্কৃতিক সংগঠন রক্সি মিউজিক গ্রুপ বর্নালী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠ, প্রভাতী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, শতদল সমাজকল্যান সংস্থা ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, গিটার মিউজিক্যাল একাডেমী, বর্তমানে যে সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তাদের নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে কতগুলো সংগীত বিদ্যালয় নামে খ্যাত। সংগীত নিকেতন, চাঁদপুর ললিতকলা, উদয়ন সংগীত বিদ্যালয়, বঙ্গজ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, সপ্তক সংগীত বিদ্যালয়, সপ্তসুর সংগীত একডেমী, সুরমালা সংগীত বিদ্যালয়, স্বদেশ সাংস্কৃতিক সংগঠন উল্লেখযোগ্য।

চাঁদপুর শহরে তিনটি নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সপ্তরূপা নৃত্য শিক্ষালয়, নৃত্যাঙ্গান ও নৃত্যধারা। এই সংগীত বিদ্যালয় ও নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। চাঁদপুরে একটিমাত্র চিত্রকলা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা জোড় পুকুর পাড়স্থ সাহিত্য একাডেমীতে প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর পরিচালানায় চাঁদপুরের বিশিষ্ট চিত্রশিক্ষক সাধন সরকার। চাঁদপুরে বেশ কিছু গোষ্ঠী রয়েছে তারাও তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে চতুরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠন যার জন্ম হয়েছিল ১৯৮৩ সনের ১৫ই মে। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, নটমঞ্চ সাংস্কৃতিক সংগঠন, লালন পরিষদ, জাগরনী সাংস্কৃতিক সংগঠন, নতুনকুঁড়ি এরাও এদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ইদানিং বেশ কিছু ব্যান্ড গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে চাঁদপুরে। এর হচ্ছে প্যারাডাইস ব্যন্ড গ্রুপ কুয়াশা ব্যান্ড গ্রুপ, অনুপম ব্যান্ড গ্রুপ, হাঁট টাচ ব্যান্ড দল প্রমুখ। চাঁদপুরে বর্তমানে সংগীতে সাহিত্যে নাটকে সাংবাদিকতায় ও চিত্রকলায় যারা অবদান রেখে চলেছেন এদের মধ্যে সংগীতে শীতল ঘোষাল, চম্পক স্যাহা, স্বপন সেনগুপ্ত, মনোজ আর্চাযী, রফিক আহমেদ মিন্টু, শান্তি রক্ষিত, অনুপ সাহা, রূপালী চম্পক, ইতু চক্রর্বতী, কৃষ্ণা সাহা, বিউটি মজুমদার, তাহমিনা হারুন, অনিতা কর্মকার, রাখী সাহা, বৈশাখী ঘোষাল তুলি, মৃনাল সরকার, স্বজন সাহা, শিপন সাহা, শংকর আচাযী, বিরেন সাহা, বাবুল চক্রবতী, পীযুষ রায় চৌধুরী, ঝুমা সাহা প্রমুখ।

চাঁদপুরের সাহিত্য অঙ্গনও বেশ সমৃদ্ধ। সাহিত্যে যারা অবদান রেখে চলেছেন তারা হচ্ছেন জীবন কানাই চক্রবর্তী, কাজী শাহাদাত, প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক দুলাল দাস, মুখলেসুর রহমান মুকুল, লিটন ভূইয়া, তৃষ্ণা গাঙ্গুলী, আক্রাম খান, এস এম জয়নাল আবেদিন, মাহবুব আনোয়ার বাবুল, প্রবীর মজুমদার বাবুল, শম্ভু আচার্যী, ফতেউল বারী রাজা (মিয়া), জাহাঙ্গির হোসেন, শম্ভু অধিকারী, জসীম মেহেদী প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপুর্ন শাখা হচ্ছে নাটক। চাঁদপুর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি শহর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজধানীর বাইরে নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চা এখনো ঘাত-প্রতিঘাত ও সমস্যাযুক্ত। তারপরেও চাঁদপুরের নাট্যাঙ্গন অনেক দিক থেকে এগিয়ে। মফস্বল শহরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা বেশ দুরুহ কাজ। নাটকের মাধ্যমে গনমানুষের কথা বলা হয়। বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে নাটক গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে। নাটক শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

আমাদের দেশের নাট্যকাররা অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের সমাজের অসংগতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। নাটকের মাধ্যমে যেভাবে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, পীড়নের কথাবলে মানুষের মনে রেখাপাত করা যায়, সেটা মিছিল ও শ্লোগান তুলে সম্ভব নয়। বাংলাদেশে যে নাট্যচর্চার সূচনা হয় তা সম্ভবত ৭০ দশকের গোড়ার দিকে। আমাদের চাঁদপুরের দুই ঐতিহ্যবাহী নাট্য সংগঠন বর্নচোরা নাট্যগোষ্ঠী ও অনন্যা নাট্যগোষ্ঠী সেই নাট্যচর্চার অংশীদার। প্রখ্যাত চলচ্চিত অভিনেতা নির্দেশক আমার বন্ধু হুমায়ুন ফরিদী চাঁদপুরে প্রতিষ্ঠা করেছিল বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। সেই নাট্য সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে পালন করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

তবে সাথে সাথে এই কথা বলতে হয় যে, বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী বেশিদিন আলোর মুখ দেখতে পায়নি। বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী থেকেই ধীরে ধীরে অনেক নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়। এর মধ্যে বর্নচোরা নাট্য গোষ্ঠী, অনন্যা নাট্য গোষ্ঠী, চাঁদপুর ড্রামা, অনির্বান নাট্যদল, চাঁদপুর থিয়েটার, অনুপম নাট্য গোষ্ঠী, অগ্নিতরুন নাট্যগোষ্ঠী, সূর্যতরুন নাট্যগোষ্ঠী, অরূপ নাট্যগোষ্ঠী, বিবর্ণ নাট্যগোষ্ঠী, বর্নমালা থিয়েটার, লোকনাট্য দল শিশু থিয়েটার ইত্যাদি।

চাঁদপুরের নাট্যাঙ্গন অনেক নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে, যাদের লেখা নাটক স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মঞ্চায়ন হয়েছে। নাট্যকার নাট্যনিদেশক অভিনেতা জিয়াউল আহসান টিটু ''লালননাম'' রচনা করে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। নাটকটি চাঁদপুর এবং ঢাকায় সফল মঞ্চায়ন হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্ব সেলিম আলদিন নাটকটির যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

চাঁদপুরের নাট্যকারদের মধ্যে যারা আজো নাটকে কাজ করে চলেছেন এদের মধ্যে আক্রাম খান, মোঃ হানিফ, লিটন ভূইয়া, শম্ভু আর্চাযী, এস এম জয়নাল আবেদিন, বিষ্ণুগুপ্ত, পি এম বিল্লাল হোসেন, চন্দন সরকার, জসিম মেহেদী, এদের প্রত্যেকের নাটক সফল ভাবে মঞ্চায়ন হয়েছে। নাট্য নির্দেশকদের মধ্যে রয়েছেন মোঃ আক্রাম খান, মোঃ হানিফ, শহীদ পাটোয়ারী, পরিমল দাস, নুপুর মজিবুর রহমান দুলাল, বি এম হান্নান, অনুপ দাস, বাবু অভিজিৎ আচার্যী, শরীফ চৌধুরী, স্বপন সাহা প্রমুখ। চাঁদপুরে চিত্রকলায় যারা অবদান রেখে চলেছেন এদের মধ্যে সাধন সরকার, অমল সেন, লিটন ভূইয়া, অজিত দত্ত, ওমর ফারুক, শুভ্রা সরকার, আবিদা সুলতানা সাকি, পলাশ সেনগুপ্ত, শুভ্র রক্ষিত, অভিজিৎ রায়, রাজিব সাহা, সমীর সরকার, সঞ্চিতা সেন, নিপা, মান্না।

নৃত্যকলায় যারা অবদান রেখে চলেছেন এরা হচ্ছেন রুমা সরকার, অনিমা সেন চৌধুরী, সোমা দত্ত, অপু রায়, রিতা দে, রিমি সাহা প্রমুখ। চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নির্বাচিত কমিটির সাধারন সম্পাদক কাজী মাহবুবুল হকের দক্ষ পরিচালনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমীর অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্পকলায় সংগীতের বিভিন্ন শাখায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। যেমনিভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সংগীত নিকেতন, চাঁদপুর ললিতকলা, সপ্তসুর সংগীত একাডেমী ও উদয়ন সংগীত বিদ্যালয়। চাঁদপুর শিশু থিয়েটার ঢাকায় জাতীয় শিশু নাট্যোৎসবে কয়েকবার তাদের নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছে। আরো কিছু শিশু নাট্য সংগীতও রয়েছে।

আমাদের চাঁদপুরে অনেক গুনী শিল্পী রয়েছে যারা সংগীত চিত্রকলায় ও নৃত্যে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়ে আমাদের চাঁদপুর বাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। এরা হচ্ছে সংগীতে বৈশাখী ঘোষাল তুলি (স্বর্ণপদক), চুমকী চন্দ (স্বর্ণপদক), দিশারী রহমান (স্বর্ণপদক), বুবলী (স্বর্ণপদক), নিয়ন (স্বর্ণপদক), সজীব বনিক (স্বর্ণপদক), দিনাত জাহান মুন্নী (স্বর্ণপদক), তন্ময়ী রক্ষিত (স্বর্ণপদক), অনন্যা আচার্যী (স্বর্ণপদক), ফয়সল রশীদ শাওন, শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য, সুস্মিতা রায় চৌধুরী, সংগীতে সাহা, নাবিলা আসরোকা অনন্যা, শর্মিষ্ঠা সরকার প্রমুখ। কবিতায় মীম রহমান কুয়াশা, জয়িতা গোস্বামী জুঁই প্রমুখ। নৃত্যে সাদিয়া মুনমুন টুম্পা, সোমাইয়া রহমান পাহাড়ী, মীম প্রমুখ।

হাতের লেখায় অনিক চন্দ। চিত্রকলায় শুভ্রা সরকার (স্বর্ণপদক), নয়ন দাস, তনু দাস প্রমুখ।চাঁদপুরে বেশ কয়েকটি শিশু সংগঠন রয়েছে যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংকুর কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা, চাঁদের হাট, জিয়া শিশু কিশোর সংগঠন প্রমুখ। এছাড়াও কিছু রাজনৈতিক অঙ্গ সহযোগী সংগঠন রয়েছে সেসব সংগঠনগুলো তাদের নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্য জোট, জাসাস, শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ প্রমুখ।

চাঁদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠকের জন্ম দিয়েছে। এরা হচ্ছেন জীবন কানাই চক্রবর্তী,অজয় ভৌমিক, শীতল ঘোষাল, বাবুল খান,শহীদ পাটোওয়ারী, রফিক আহমেদ মিন্টু, লিটন ভূইয়া, এস এম জয়নাল আবেদীন, হারুন আল রশীদ, এডভোকেট বদিউজ্জামান কিরন, বি এম হান্নান, তপন সরকার, ইব্রাহিম কাজী জুয়েল, স্বপন সাহা প্রমুখ। চাঁদপুরের বেশ কয়েকজন কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার জাতীয় পযায়ে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন। তারা হচ্ছেন এস ডি রুবেল, কবির বকুল, মিলন খান, সোহাগ হাসান, আমিন বাদল, গৌতম চৌধুরী, দিনাত জাহান মুন্নী, শাওন দীপ (দীপক) প্রমুখ। চাঁদপুরে দুটি গীটার সংগঠন রয়েছে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে সুরাঙ্গান আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশ গীটার শিল্পী সংস্থা। তবে সুরাঙ্গানই শুধু প্রতিনিয়ত গীটারের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ অনেক ব্যস্ততার মধ্যে চাঁদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গাঁনের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখার দুঃসাহস করেছি। ভুলবশঃত এবং নিজের অজান্তে যারা সাংস্কৃতিক অঙ্গাঁনে কাজ করে যাচ্ছেন এবং অবদান রাখছেন হয়তোবা অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এই লেখায় সন্নিবেশিত হয়নি, তাই পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ভুল না বোঝার জন্য। তবে চেষ্টার ক্রটি করিনি একথা হলফ করে বলতে পারি। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ পড়ে যায় তাহলে লেখকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আবার কোনদিন লেখার সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই আগামী লেখাতে ভুল ক্রটিগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। সবার মঙ্গাল কামনায়।

নদী ভাঙ্গন ও চাঁদপুর জেলা

হোয়াংহো নদীকে বলা হতো চীনের দুঃখ, সেই হোয়াংহোই চীনকে পরিচিতি করেছে পৃথিবীর বাকী অংশের সাথে। সে রূপ বলা যায় মিশরের নীল নদ, রাশিয়ার বলগা, আমেরিকার আমাজান, ভারতের গঙ্গা-যমুনা অথবা পাকিস্তানের সিন্ধু নদের কথা। চাঁদপুরের মেঘনা তেমনই এক বিশাল নদী। নিজের বিশালত্ব নিয়ে পৃথিবীর খ্যাত। মেঘনা আমাদের জন্যে খ্যাতি বয়ে আনলেও জ্বালাতনও কম করেনি। মেঘনার আগ্রাসী ভালো বাসায় আমাদের প্রাণ যেতে বসেছে। প্রায়ই তার ছোবল আমাদের অনেক প্রাণ বেজর নয়, ধ্বংশ করতে উদ্যত হয় লোকালয় আজ। আমাদের জনপদের ইতিহাস অনেকটাই নদী নির্ভর, বিশেষ করে মেঘনা এই জনপদের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে আষ্টে পৃষ্ঠে। চাঁদপুর শহরসহ জেলার ৩ টি উপজেলা প্রমত্তা মেঘনা, ডাকাতিয়া ও ধনাগোদা নদীর অব্যাহত ভাঙনের শিকার। নদী সমূহ এখন চাঁদপুরের অস্তিত্ব নিয়েই টান দিয়েছে। ফলে বদলে যাচ্ছে জেলার মানচিত্র।

যে নদীর কল্যাণে চাঁদপুর দেশ-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে, আবার সেই নদীর হিংস্র থাবায় চাঁদপুরের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে আজ । এককালের 'প্রাচ্যের প্রবেশ দ্বার' হিসাবে খ্যাত দেশের অন্যতম নদীবন্দরের আজ করুণ হাল। যে নদী চাঁদপুরকে করেছে এতটাই হৃদ্য, সেই নদী কেড়ে নিয়েছে অনেক অনেক কিছু। নদী যা দিয়েছে কেড়ে নিয়েছে তার চেয়ে কম নয়। হিসাবের পাল্লায় পাওনার চেয়ে দেনার পাল্লাটা অনেক ভারী। প্রায় ৩শ' বছর ধরে চাঁদপুরের প্রধান সমস্যা নদীভাঙন। এক সময় মেঘনা ছাড়াও অন্যান নদী যেমন ডাকাতিয়া, ধনা গোদা প্রমত্তা ছিল। বর্তমানে নদী দুটো অনেকটা ক্ষীন হয়েগেছে।

ব্রিটিশ সার্ভেয়ার কোলম্যান জেএমের লেখা 'ব্রক্ষপুত্র নদীর গতিপথ' বই থেকে জানা যায়, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পদ্মা নদী ফরিদপুরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরের সঙ্গে মিশতো। কিন্তু ওই বছর সংঘটিত একটি ভূমিকম্পের ফলে ব্রক্ষপুত্র নদী তার গতিপথ হারিয়ে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়। এ সময় যমুনা নদীর পানির প্রবাহ বেড়ে গিয়ে গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গা ভয়ঙ্কররূপে আগের গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান চাঁদপুর শহরের ছয় কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে মতলব (উত্তর) উপজেলার এখলাছপুরের কাছে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিশে চাঁদপুরের পার্শ্ব ছুঁয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সেই ছোঁয়া থেকে চাঁদপুরে নদী ভাঙ্গান শুরু।

বাংলাদেশের নদীগুলোর বহন করা শতকরা আশি ভাগ পানি চাঁদপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া, মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়। ফলে চাঁদপুরের ওপর প্রতি বছরই বিশাল পানির চাপ এসে ধাক্কা মারে। পানির তোড়ে হারিয়ে যায় বিভিন্ন লোকালয়। চাঁদপুর শহরের মোলহেড থেকে আড়াই কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিক দিয়ে পদ্মার একটি শাখা নদী, দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আরেকটি শাখা প্রবাহিত এবং মোহনপুরের কাছে সরাসরি পদ্মার প্রবাহ মেঘনার সঙ্গে এসে মিশেছে। এই তিনটি স্রোত ধারার বিশাল স্রোত মেঘনায় এসে প্রবল আকার ধারণ করে, যতই দিন যাচ্ছে মেঘনার তলদেশ ভরাট হওয়ার কারণে, নদীর দু'কুল উপছে বন্যার পানি ভূভাগে প্রবেশ করে। পানির প্রবল স্রোত দু'কুল ভেঙ্গে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়।

এই মিলিত প্রবাহ ভরা বর্ষায় প্রচন্ড রকম ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ইতিহাসে থেকে জানা যায়, আজ থেকে ১২৫ বছর আগে নদীভাঙন তথা মেঘনার পানিপ্রবাহের চাপ কমানোর জন্য ১৮৩১ সালে চাঁদপুর শহরের ওপর দিয়ে সদর উপজেলার চরবাগাদী পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার দীঁঘ একটি খাল খনন করা হয়েছিলো। এ খালটি পরবর্তী সময় ডাকাতিয়া নদীর মূল স্রোতের সাথে গিয়ে মিশে এবং ডাকাতিয়ার প্রধান ধারায় পরিণত হয়। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাঁদপুর শহরের অবস্থান ছিল নরসিংহপুর এলাকায়। অর্থাৎ বর্তমান শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ। ভাঙতে ভাঙতে শহর এসে প্রবেশ করেছে ৬০ কিলোমিটার পুর্ব-উত্তরে। ৬৯ বছর আগে চাঁদপুর শহরের অবস্থান ছিল আরো ৬ কিলোমিটার উত্তর ও ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে। এখন ভাঙনের অবস্থা এতই ভয়াবহ যে, পুরো চাঁদপুর শহরের অস্তিত্ব বিলীন হয় হয় অবস্থা। হয়তো আগামী শতাব্দির শুরুতে বর্তমান শহরকে বর্তমান শহরকে ইতিহাসের পাতায় খুঁজতে হবে।

১৯৭২ সাল থেকে চাঁদপুর শহরের ভাঙন পরিস্থিতি ভয়াবহ। '৮৮ থেকে নদী শহরের শেকড় ধরে টান দিতে শুরু করে। ১৯৯৫ সালের ২১ আগস্ট চাঁদপুর শহরের পুরানবাজার এলাকার মৌলভীঘাট ও ১ নম্বর ঘাট এলাকার ৫০ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চোখের পলকেই নদীতে তলিয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে বর্তমান শহররক্ষা বাঁধ দেবে যায়। ২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর চোখের পলকে চাঁদপুর নৌ বন্দরের টার্মিনাল ভবন ও বড়রেল স্টেশন বিলীন হয়ে যায়। এখন বাঁধের ৭১ কিলোমিটার থেকে ৮১.০৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা ভয়াবহ নদীভাঙনের শিকার।

২০০২ সালের জুলাই মাসে হাইচরের চরশোলাদী ও মোল্লাকান্দি এলাকা দিয়ে মূল বাঁধ ভেঙে গেছে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় হাইমচরের তাঝখারকান্দি এলাকা দিয়ে প্রায় ৫০০ ফুট বাজার এলাকা দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে যায়। এভাবে অব্যাহত নদীভাঙনের ফলে প্রকল্প এলাকারই কমপক্ষে ৭ হেক্টর জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙ্গন প্রতিরোধে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

মতলবেও মেঘনা এবং ধনাগোদা নদীর ভাঙনে বহু এলাকা, বিশেষ করে এখলাছপুর, মোহনপুর, ষাটনল, ফরাজীকান্দি, জহিরাবাদ, দুর্গাপুর, নন্দলালপুর, গাজীপুর, নায়েরগাঁও, উত্তর বাইশপুর বিভিন্ন ইউনিয়ন ক্ষতিবিক্ষত হয়ে আছে। ওই এলাকাকে ভাঙন ও বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক বর্তমান মতলব উত্তর উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ১৭ হাজার ৮শ' ৮৪ হেক্টর এলাকা নিয়ে মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়।

চাঁদপুর হাইমচর উপজেলার নদী সংলগ্ন পল্লীতে মেঘনা বিনা বাধায় তান্ডব চালাচ্ছে ১৯৫০ সাল থেকে। অব্যাহত ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণভাবে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। যে দুটি ইউনিয়ন নদীতে বিলীন হয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে হাইমচর ও চরগাজীপুর। বাদবাকি ৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে নীলকমল ইউনিয়নের অর্ধক, চরভৈরবী ইউনিয়নের ৪ ভাগের ৩ ভাগ নদীতে চলে গেছে। বাকি ২ ইউনিয়ন কোনোভাবে হাইমচরের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। উপজেলা হিসেবে হাইমচর এখন খুবই ছোট আকৃতির একটি উপজেলা অপর দিকে চাঁদপুর সদরের বিষ্ণুপুর, ইব্রাহিমপুর, হানারচর, রাজরাজেশ্বর, সাখুয়া, তরপুরচন্ডি, কল্যানপুর, রামপুর ইউনিয়ন ভয়াবহ নদীভাঙনের শিকার।

এর ভেতর বিষ্ণুপুর, হানারচর, ইব্রাহিমপুর ও রাজেরাজেশ্বর ইউনিয়নের অস্তিত্ব এখন বিলীন হওয়ার পথে। মেঘানার ভাঙন থেকে রক্ষা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মেঘনা ধনাগোদ সেচ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু হয়। প্রকল্পটিরও কাজ চলাকালে ১৯৮৭ সালে দুর্গাপুর এবং ৮৮ সালে নন্দলালপুর এলাকা দিয়ে বাধ ভেঙে যায়। ফলে ওইসব এলাকা থেকে কিছুটা পেছনে সরে এসে আবার বাঁধ তৈরি করতে হয়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ১শ' ৪৬ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পের চারধারে রয়েছে ৬০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। প্রকল্পের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে মেঘনা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে ধনাগোদা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রকল্পটির বাঁধ বিভিন্ন স্থান দিয়ে নদীভাঙনের শিকার হচ্ছে।

চাঁদপুর শহরসহ সদর, মতলব ও হাইমচর রক্ষায় আজ পর্যন্ত কোনো পরিকল্পিত কাজ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে চাঁদপুর শহররক্ষা প্রকল্প, মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষার নামে প্রায় ৩শ' কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পেই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৯০ কোটি টাকা। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পে গত ৮ বছরে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। চাঁদপুর সেচ প্রকল্পে ১৯৮৮ থেকে এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। চাঁদপুর শহর সংরক্ষণে এ পর্যন্ত বহু পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে চাঁদপুর শহরকে নদীভাঙানের হাত থেকে রক্ষার জন্য ১শ' ১০ কোটি টাকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার কাজ করার পরই ওই পরিকল্পনাটি বাতিল করা হয়। এরপর ১৯৮৮ সালে ২১ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেদারল্যান্ডসের হাসকানিং রয়েল ডাচ কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স ও স্পট হাইড্রোলিকস অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল সার্ভিসেস চাঁদপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় মেঘনা নদীতে জরিপ কাজ চালানো শুরু করে। ১৯৯২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জরিপ শেষে তারা ১৫ মার্চ ৪শ' ২৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প দাখিল করে। ওই প্রকল্পটির আজো কোনো খবর নেই।

এছাড়া ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ ৩০ হাজার টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পটির কাজ ৯৮ সালে শুরু করা হয়। কিন্তু ২০০০-০২ অর্থবছর পর্যন্ত ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকা পাওয়া যায়। উল্লিখিত অর্থবছরেই প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে ওই কাজ শেষ করা যায়নি। স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব মতে, ৩৩ বছরে চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ কাজে প্রায় ৮৫ কোটি টাকার মতো ব্যয় হয়েছে সংরক্ষণ কাজে। বাদবাকি টাকা ওভারহেড কাজে ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত ওই অর্থ নদী স্রোতের তীব্রতার কাছে খড়কুটা তুল্যও নয়। যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে কাজ করতে না করতে অন্য স্থান দিয়ে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। কৃত কাজ স্রোতের মুখে অসহায় হয়ে পড়ে।

মেঘনা নদীকে শাসন করা না গেলে অদুর ভবিষৎ এ দেশের মান চিত্র থেকে আমাদের সুন্দর শহরটি হারিয়ে যাবে এটা এক প্রকার নিশ্চিত। চাঁদপুর অঞ্চলের বহু পুরাকীর্তি মেঘনা খেয়ে ফেলেছে। চাঁদপুর শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহমান মেঘনা নদী দিয়ে স্বাভাবিক সময়ে প্রতি সেকেন্ডে ১ লাখ ৪০ হাজার কিউসেক পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। বর্ষা মৌসুমে সাড়ে ১২ থেকে ১৩ লাখ কিউসিক পানি প্রবাহিত হয়। পানির ওই বিশাল প্রবাহ চাঁদপুর শহররক্ষা বাঁধে এসে বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে।

প্রতি সেকেন্ডে স্রোতের গতিবেগ ১৮ থেকে ২৫ ফুট পর্যন্ত। পানি ও স্রোতের চাপে চাঁদপুর শহর এখন বিলীন হওয়ার পথে। শহরের বড় স্টেশন এলাকায় মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর দুরত্ব বর্তমানে ১শ' ফুটের

মতো। ওই দুটো নদী একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উন্মত্ত বাসনায় ক্রমাগত এক অপরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যদি কোনোভাবে এই দু'নদী একত্রিত হয়ে যায় তাহলে চাঁদপুর শহরসহ দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এলাকাসমূহ তথা শহরের পুরাণবাজার এবং চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষার আর কোনো পথ থাকবে না।

হিমালয় ও লুসাই পাহাড় থেকে বয়ে আনা পতি মেঘনার তলদেশ অতিদ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই, পানি বিশষজ্ঞরা প্রথমেই যে বিষয়টির ওপর জোর দিচ্ছেন সেটি হচ্ছে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে পার্শ্ববতী লক্ষ্মীপুরের হাজীমারা পর্যন্ত এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে নদীতে খনন কাজ চালানো এবং জেগে ওঠা ডুবুচর অপসারণ করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো। অন্যথায় চাঁদপুর নামে জনপথ ইতিহাসের বাঁক বদলে মানচিত্র থেকে অচিরেই হারিয়ে যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে না চাঁদপুর শহর সহ চাঁদপুর সদর, মতলব, হাইমচর উপজেলা। উল্লেখ্য চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর ও লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ উপজেলাকে নদীভাঙনের কবল থেকে রক্ষার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ছিলো, সে অনুযায়ী ১৯৬২ সালে ৫৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প বা সিআইপি নামে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়।

৫৭ হাজার হেক্টর কাজ শুরু করা হয়। ১৯৭৮ সালে এর কাজ শেষ হয়। একশ' কিলোমিটার দীর্ঘ বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি করা হয় প্রকল্পের চারদিকে। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন ১৯৬৯-৭০ সালে চরআবাবিল থেকে চরবংশী পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার, ১৯৭৫-৭৬ সালে রামদাসদী থেকে হাইমচর পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে যায়। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৮০-৮১ সালে হাইমচরে ২ কিলোমিটার, ১৯৯১-৯২ সালে গোবিন্দপুর থেকে সিকিলামচী পর্যন্ত ৮.৩৮ কিলোমিটার, ১৯৮৮ সালে কালিমপুরে ১ কিলোমিটার, ১৯৯৩ সালে হানারচরের কাছে ১ কিলোমিটার বাঁধ নদীতে ভেঙে যায়। এই অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, মেঘনাকে অবশ্যই শাসন করতে হবে।

বাংলাদেশ ধারনার বিরোধী তথা স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ

ইতিহাসের পটভূমি সময়ের বাস্তবতায়-গণদাবীতের পাল্টে যায়। বাংলায় মুসলিম শাসন কাযেমের আগে বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যে বৃহৎ বাংলাদেশ তার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি ছিলো । রাঢ়, সমতট , হরিকেল, বঙ্গ, গৌড় এই পাঁচটি রাজ্যই প্রধান ছিলো। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সর্ব প্রথম তিনটি রাজ্যকে একত্রিত করে গৌড় সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন। বহুদিন পর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম রাজ্য পাঁচটি মিলিয়ে একটি বৃহৎ রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং নাম দেন বাঙ্গালা। নিজেকে ঘোষণা করেন ''শাহেন শাই বাঙ্গালা'' সে প্রায় হাজার বছর আগের কথা। এরূপ চলে আসছিলো দীর্ঘ সময়। ১৫৭৬ সালে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে সৃষ্টি করেন সুবে বাঙ্গালা। স্বাধীন নবাব মুর্জিদ কুলীখান যে নবাব তন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন তার সীমা ও কমবেশি একইরূপ ছিলো।

১৭৫৭ সালের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসকরা যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সৃষ্টি করেন তাতেও মুলত সুবে বাঙ্গালার সীমানা অপরিবর্তীত ছিলো।

১৯০ বছরের শোষণ-শাসন থেকে বাঙ্গালার মুসলিম সম্প্রদায় পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলো। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারী থেকে আহরিত সম্পদ দ্বারা কলিকাতাকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলে ছিলো।

অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের নিজেদের গড়া রাজধানী ঢাকায় নাগরিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলো। এমত অবস্থায় মুসলিম প্রজাকুলের দাবীর প্রেক্ষিতে ভাইসরয় লড কার্জন ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন ১৩১২ বাংলা সন বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে আসমের কিছু অংশ নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সে সময় সারা ভারত বর্ষের হিন্দু সমাজ দুবার আন্দোলন গড়ে তোলেন, ফলে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের ফলে ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায়। মুসলিম সম্প্রদায় বাংলা নামক প্রদেশে তাদের সংখ্যা ঘরিষ্টতা হারায়। ঢাকা দিন দিন ম্লান হয়ে যেতে থাকে অপর দিকে পুর্ববঙ্গে অর্থে কলিকাতা আবারো তিলোত্তম হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাপ তার স্থান দখল করে নেয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জিদ্ব-জাতিতত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আবেগের ওপর গড়ে ওঠে। '৪৭ এর পরে দ্বিজাতিতত্ত্ব বেশি সময় জনপ্রিয় থাকলো না। জিন্নাহ্ ও লিয়াক আল খানের মৃত্যুর পর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার কেউ থাকলো না পাকিস্তানে।

দেশটা পড়ে যায় পাঞ্জাবী সামরিক বেসামরিক আমলাদের কবলে। ব্রিটিশ প্রভুদের শিক্ষায় শিক্ষিত এসব আমলারা দেশটার বারটা বাজিয়ে ছাড়ে।

ভালোবাসার অপর পৃষ্ঠে ঘৃনা লুকিয়ে থাকে তাই দ্রুত বাঙ্গালীদের মেহে খুঁচে যায়। পাঞ্জাবী আমলা চক্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পুর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। নব প্রজন্ম যারা '৪৭ এর পরে জন্ম গ্রহণ করেচে বা সামান্য কিছু আগে জন্ম গহণ করে ছিলো সেই যুবশক্তি পাকিস্তান বিরোধী হয়ে ওঠে। কিন্তু যে সব মুসলিম প্রজা তথা বাঙ্গালা মুসলিম কৃষক কুলের শিক্ষিত সন্তানরা, যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলো, হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করেছিলো তারা পুনরায় হিন্দুদর অধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় মেনে নিতে পারেনি। তারা শেষ প্রচেষ্টায় হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় নিজেদের প্রবৃত্ত করে। মুলত ঃ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনই দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলো।

১৭৫৭ সনের ২৩ জুন বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। সাগর পাড়ের বেনিয়া ইংরেজ , বাংলার মসনদে রাজশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ১৯০ বছরে শাসন শোষণ চলার পর বাংলার পুর্ব-অংশ ও আসামের সিলেট জেলার মুসলীম সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ পুর্ব পাকিস্তান রূপে গঠিত হয়ে পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশের মর্যাদা পায়।

১৯০ বছর পর মুসলিম জন সাধারণ অত্যাচার অবিচার আর জুলুমের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পায়। ব্রিটিশ রাজ শক্তি ও তাদের এদেশীয় তাবেদার হিন্দু জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ীসহ মহাজন, আমলা মুৎসুদ্দীদের অত্যাচার, শোষণ নিস্পেষণ থেকে বেরিয়ে আসার মানসে বাংলা ও আসামের মুসলিম কৃষক প্রজাকুল সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

সেই রায় অনুসারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই এদেশের দরিদ্র কৃষককুলের আশা ভঙ্গ হয়। ৬ ফুট লম্বা গৌরবর্ণের সুঠাম দেহের পাকিস্তানীরা গড়ে ৫ফুট ২ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণকায় দুর্বল পুর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভাই হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। পুর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালীদের ভাগ্যে শুধু ব্যঙ্গোক্তি এবং ঘৃনাই ললাটের লিখনরূপে প্রতিভাত হয়। ২৩ বছরের শাসন শোষণ পাকিস্তান নামের

স্বর্গটির প্রাপ্তি বঞ্চনা রূপেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের নব প্রজন্ম পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক শাসক শোষক, ব্যবসায়ী, নব্য ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গণ ম্যানডেট লাভ করেন। এই নির্বাচনের হাত ধরে আসে ইয়াহিয়া খানের গোয়ার্তুমি, স্বাধীন বাংলাদেশের দাবী এবং ২৫ মার্চের কালো রাতের অপারেশন সার্চলাইট।

বাঙালীদের প্রতিরোধ যুদ্ধ, যার অবিসম্ভাবীরূপ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের অপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করলেও, চরম হিন্দু বিরোধী, পাকিস্তান আন্দোলন তথা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল তার নেতা কর্মীরা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে। এরাই পাকিস্তানের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। সারা দেশের মতো চাঁদপুর জেলায় ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে তাদের অত্যাচার খুন, ধর্ষন, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের মতো অপরাধ মানবইতিহাসে ওদের কুখ্যাত করে রেখেছে। বাংলাদেশ যত দিন স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখবে, ৩৩ দিন এই ঘাতক শ্রেণী বেইমান রাজাকারর আলবদর হিসেবে ঘৃনিত হবে।

দালালদের সমাচার (তথ্য সুত্র ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ)

মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের অধিকাংশ দালাল ছিল মুসলিম লীগ, জামাত, কনভেনশন মুসলিম লীগ, পিডিপিসহ ধর্মভিত্তিক দলের নেতা। বর্ণিত দল সমূহের চাঁদপুরের নেতা কর্মীরা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো চাঁদপরের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠন করে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস ও মুজাহিদ বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধকালে চাঁদপুরের ম্যালেরিয়া অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা ছিল পাকবাহিনী ও রাজাকরদের ঘাঁটি। ম্যালেরিয়া অফিসে মতিউর রহমান জোয়ারদার, মকসুদুর রহমান, কবীর আহম্মদ, শফিউদ্দিন আহম্মদ, বজলুর রহমান, ইদ্রিছ মিয়াকে রাজাকার ও পাকবাহিনী নির্যাতনের পর হত্যা করে।

কৃষি বিভাগের ফয়েজ আহম্মদ, ওয়াপদার নাজিমুদ্দিন ও মাহফুজুল হককে রাজাকার ও পাকবাহিনী ধরে নিয়ে হাত পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। চাঁদপুর মহকুমার (বর্তমান জেলা) দালালদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন মাওলানা মান্নান, আলহাজ্ব আঃ সালাম মোক্তার, আনোয়ার হোসেন, আবদুল লতিফ চেয়ারম্যান, মাওলানা শামসুল হুদা, আয়াত আলী ভূঁইয়া, এম. এ. আলম আবদুল হক, আবদুল মজিদ মীর আঃ রাজ্জাক প্রমুখ। এদের মধ্যে সবচাইতে বেশি মানুষ হত্যা করেছে হাজিগঞ্জের রাজাকার কমান্ডার কুখ্যাত বাচ্চু।

রাজাকার বাচ্চু' ৭৫ পরবর্তী সময়ে হাজিগঞ্জ পৌর সভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলো। ফরিদগঞ্জ থানার মাওলানা মান্নান ছিলেন শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য। চাঁদপুরে তিনি ছিলেন আলবদর ও রাজাকার বাহিনী গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বিবৃতি , বক্তৃতা ও সাংগঠনিকভাবে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন দেন। ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ জেহাদের জোশে আগাইয়া আসিয়াছে। আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনী সকল অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করিয়াছে।'' ২৭ সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল লেঃ জেঃ নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকবাহিনীকে সহযোগিতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যায় মাওলানা মান্নান জড়িত বলে ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী অভিযোগে করেছিলেন। মাওলানা মান্নান স্বাধীনতা যুদ্ধ কালীন একজন ভয়ংকর যুদ্ধ অপরাধী।

স্বাধীনাতার পর তিনি ধরা পড়েন। কিন্তু অভিযোগে রয়েছে , তিনি রমনা থানা থেকে পালিয়ে যান। ১৯৭২ সালের ৭ মে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় মান্নানের ছবি ছেপে নিচে "এই নরঘাতককে ধরিয়ে দিন " শীর্ষক প্রতিবেদন বের হয়। ওই রিপোর্ট ফরিদগঞ্জে রাজাকার বাহিনী গঠন , ফরিদগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মজিদ ও ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী করা হয়। "৭৫- এর পর মাওলানা মান্নান পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং জিয়া ও এরশাদ আমলে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিছুদিন আগে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

চাঁদপুরে শান্তি কমিটি গঠিত হয় ১১ মে।চাঁদপুরের প্রাক্তন এম. এল . এ . আলহাজ্ব , এম. আবদুস সালাম ছিলেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তার বাড়িতে প্রায়ই শান্তি কমিটি ও পাকবাহিনীর সভা অনুষ্ঠিত হতো। তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করে বিবৃতি ও বক্তৃতা দেন এবং চাঁদপুরে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। শান্তি কমিটি সদস্য ছিলেন চাঁদপুরের আবদুল লতিফ চেয়ারম্যান , মাওলানা শামছুল হুদা , আয়াত আলী ভূঁইয়া , আহম্মদ উল্লাহ , হাবিবুল্লাহ চোকদার , আনোয়ার হোসেন মিয়াসহ আরো অকে বেঈমান বাঙ্গালী মুসলিম লীগ নেতা আয়াত আলী ভূঁইয়ার বাসাই প্রায়ই বৈঠক বসতো শান্তি কমিটির ও রাজাকারদের।

মে মাসেই চাঁদপুরের বিভিন্ন থানায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। হাজীগঞ্জ থানায় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক হন আনোয়ার হোসেন , মতলব থানার আহ্বায়ক হন আবদুল হক , কচুয়া থানার আহ্বায়ক হন আঃ মজিদ। এদের নেতৃত্বে উল্লিখিত থানাগুলো রাজাকারদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। পাকবাহিনীর দোসররা চাঁদপুর শহরের গনি আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজাকার ঘাঁটি গড়ে তোলে। চাঁদপুরের কূখ্যাত রাজাকার ছিল মোহম্মাদ আলী আকবর বকাউল। স্বাধীনতার পর জনতার হাতে সে নিহত হয়। বলাখাল পূর্বপাড়ার রাজাকার আবু আহমেদকেও জনতা হত্যা করে। দোপাল্লার খ্যাত রাজাকর আনা মিয়া জনতার রুদ্র রোষে পড়ে প্রাণ হারায়। তবে বেশির ভাগ রাজাকার আত্মগোপন করে। তাদের কেউ কেউ অস্ত্র-সস্ত্র সহ ১৬ ডিসেম্বরের পরে পড়ে ওঠা ভূয়া মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অর্জনে কলংক লেপে দেয়। এরাই হাইজ্যাকার হিসেবে নতুন বাংলাদেশ, আর্বিভূত হয়।

শান্তি কমিটি ও রাজারকারদের তৎপরতা জুন মাসে বৃদ্ধি পায়। এদের সহযোগিতায় চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনী গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ৩০ জুলাই চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জনাব আলী ময়দানে শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দালালদের এক সভায় দেশের পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে ভারতকে দায়ী করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আজিজুর রাহমান , মাজেদুল হক , সামাদ ও দলিলুর রহমান। এরা সকলে বৃহত্তর কুমিল্লার দালাল। হাজীগঞ্জ জুনাব আলী ময়দানের পশ্চিম পার্শ্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ের দোতলা ভবনে রাজাকর সদরদপ্তর স্থাপন করে।

চাঁদপুরের ইচলী গেস্ট হাউজ ৭১ সালে রাজাকারদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ২১ সেপ্টেম্বর এখানে শান্তি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা শামসুল হক , আবদুল হামিদ , মজিদ মজুমদার , সিরাজুল ইসলাম , শহীদ্দুলাহ , নজরুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন , ''আওয়ামী লীগ জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। এই বেঈমানদের এমনকি আমাদের বংশধরাও ক্ষমা করবে না।'' ২১ নভেম্বর মতলবে শান্তি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ্ব এম . এ. সালাম , জামাত নেতা অধ্যাপক আবদুল রব , গোলাম মাওলা চৌধুরী ও নুরুল ইসলাম। জামাত নেতা রব বলেন , স্বাধীনতার নামে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করছে তারা দেশের শত্রু।

মুক্তিযোদ্ধাদের সবায় দুস্কৃতিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদের হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়, ১১ নভেম্বর বদর দিবস উপলক্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক ছাত্র জমায়েত হয় চাঁদপুর কলেজ মাঠে। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রসংঘের নেতা হাবিবুল্লাহ। বক্তৃতা দেন ছাত্র নেতা আবদুল রব, আবুল বাশার ও নূরুল্লাহ। জমায়েত শেষে হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। উল্লিখিত সকলেই বদর বাহিনীর নেতা ছিল। ৫ ডিসেম্বর আবসুদ সালামের সভাপতিত্বে চাঁদপুর শান্তি কমিটির এক সভায় ভারতীয় বিমান হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়। তিনি ঘোষণা করেন মর্দে মমিন, পাকিস্তানীরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও পাকিস্তান রক্ষা করবে।

শুধু ধর্মভিত্তিক দলগুলোই নয় , মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের একদল স্বার্থন্বেষী লোকও আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পাকবাহিনীর পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। চাঁদপুর মহাকুমা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি চাঁদ বখ্শ পাটোয়ারী , মহকুমা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ কফিলউদ্দিন চৌধুরী এবং ডাঃ মজিবুর রহমান (মিজানুর রহমান চৌধুরীর ভাই) ১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার শপথ নেন। ৯ ডিসেম্বর (৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১.০০টায়) চাঁদপুর শহর শত্রু মুক্ত হলে রাজাকার ও শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পালিয়ে যায়।

পাঠান বাহিনীর সর্বশেষ যুদ্ধ ঃ

১৪-১২-৭১ তারিখ। জনগণ পাঠান সাহেবের কাছে খবর নিয়ে আসে কোথায় হতে একদল পাকবাহিনী লঞ্চে করে সফরমালি এসছে। সম্ভবতঃ তাদের জ্বালানি নেই অথবা লঞ্চটি বিকল হয়ে চরে আটকা পড়ে আছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাঠান সাহেব নিজে একটি সেকশান নিয়ে সফরমালির কাছে মেঘনা নদীতে পাকবাহিনীর লঞ্চে আক্রমণ করেন। সেখানে পাঠান সাহেবের সাথে অন্যান্য গ্রুপের আরো মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। সতন্ত্র এফ. এফ. কোম্পানী পাঠান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং নিজেদের পাঠান ট্রুপসের কমান্ডের সাথে একত্রিত করে। আক্রমণের সাথে সাথে সেখানে ১০০শ' পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সারেন্ডার করে। তারা সবাই পবিত্র কোরআন শরিফ গলায় বেঁধে আত্মসমর্পণ করে।

৯ ডিসেম্বর ভোর থেকেই পাকবাহিনীর পরাজয়ের সাথে সাথে সাধারণ মানুষ রাস্তায় মেঝে আসে, রাজাকার ও দালালদের ধরে আনে। কোথাও জনতা রাজাকারদের পিটিয়ে হত্যা করে। পাকসেনাদের দখলদারীর সময়ে রাজাকার দালালরা চাঁদপুরের আশেপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ জনতাকে ধরে এনে যে অত্যাচার করেছে, যে ভাবে তারা নিরীহ মানুষদের মেরেছে সে তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিশোধ ছিলো সীমিত। চাঁদপুর বড় স্টেশনে যাকে একবার ধরে নিয়ে যাওয়া হত তাকে আর ফেরত আসতে দেয়া হত না। চাঁদপুর পুরাণবাজারে সংগ্রামী জনতা দলাল রাজাকারদের বাড়িঘর ঘেরাও করে তাদের ধরে এনে অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তবে মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর টাইগার নিয়াজী যৌথ বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জগজিৎ সিং অবোরার কাছে লক্ষাধীক সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

অলিপুর গ্রামের আর এক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাঃ (অবঃ) আব্দুল কাদের পাটওয়ারী সেই আত্মসমার্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২৯-১২-৭১ তারিখ চাঁদপুর এরিয়া কমান্ডার সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের কাছ থেকে টাইপ করা কাগজে মুক্তিযোদ্ধা (এফএফ) হিসেবে পাঠান কোর্সের সদস্য হিসেবে সনদপত্র পাই। পাকবাহিনী এবং আমাদের সকল অস্ত্র পাঠান সাহেবের কাছে জমা দেয়া হল। অস্ত্রগুলো ছিলো, আর আর সিক্স পাউন্ডার, এইচএমজি চাইনিজ ষ্টেনগান, এলএমজি, ৩ ইঞ্চি মর্টার,

রকেট লাঞ্চার, প্রচুর রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড ও গোলা বারুদ। আমাদের পরিচয়পত্র দেয়ার পর সাবসেক্টর কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে ফল-ইন করে আর্মি নিয়মে মাঠে বসানো হলো।

আমরা সবাই মাঠে বসে আছি। প্লাটুন কমান্ডার ও অন্যান্য মান্ডারগণ আমাদের সতর্ক হয়ে বসে থাকতে বললেন। যথাসময়ে সম্পূর্ণ ইউনিফরমে সাবসেক্টর কমান্ডার উপস্থিত হলেন। তিনি হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন। জহিরুল হক পাঠান সাহেব চাঁদপুরে মাটি থেকেই এই বিশাল সশস্ত্র মুক্তি সেনার দল গড়েছেন, যুদ্ধাস্ত্রের বেশির ভাগ হানাদার বাহিনী থেকে যুদ্ধ জয়ের পর সংগ্রহ করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বা অঞ্চলে ব্যক্তির নামে গড়ে ওঠা সেনাদল সমুহের কথা সেইসব মুক্তিসেনাদের অধিনায়কের প্রচার মুখীতার জন্যে খুব ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু জহিরুল হক পাঠান ও তার অনুগামী সাথী যোদ্ধারা প্রচার বিমুখ ছিলেন, তাই পাঠান বাহিনীর ঝুলিতে ৬৪টি স্বীকৃত সামরিক সংঘর্ষ যার মধ্যে একটি পুর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকার পরও দেশের এ যাবত প্রণীত ইতিহাসে অজয় পাঠান বাহিনীর কথা অনুল্লেখ রয়ে গেছে। ১২০৪ সাবসেক্টরের কতিপয় মুক্তি সেনা ১৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সংগঠনের স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তভুক্ত হয়েছেন কিন্তু বেশির ভাগ যোদ্ধা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উপক্ষো আর বঞ্চনার শিকার হন। স্বাধীন দেশে নিগৃহীত হয়ে জীবন পাত করেছেন। যেমন একজন মুক্তি সেনার নাম খলিল সর্দার (১৯৭১ সনের পুর্বে নৌকা মাঝি ছিলেন) অলিপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা এই খলিল সর্দার যুদ্ধের সময় বিশাল দেহের অধিকারী শক্ত সামর্থ মুক্তি সেনা ছিলো, অসীম সাহসে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম্য ষড়যন্ত্রে জেলে অন্ধকার কুঠিতে হারিয়ে গেছে তার জীবনের মুল্যবান সাতটি বছর। পরে দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ পত্রিকার উদ্যোগে খলিল সর্দার পুনর্বাসন নামক একটি কর্মসুচির ফলে শেষ জীবনে খলিল সদার চিকিৎসা সেবা সহ পুনর্বাসনের সুযোগ পেলো খলিল সর্দারের পক্ষে তার স্ত্রী রঞ্জন বিবি দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিনের উপস্থিতিতে যুদ্ধকালীন কমান্ডার জহিরুল হক পাঠান ও বিচারপতি আব্দুর রোউফের হাত থেকে একটি (ক্রেস্ট সহ কিছু নগদ অর্থ গ্রহণ করেন দুঃখের বিষয় হচ্ছে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা খলিল সর্দারের নাম দেশের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় স্থান পায়নি।

চূড়ান্ত যুদ্ধ ও বিজয় ঃ

প্রকৃত অর্থে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সনের ৩০ নভেম্বর। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর ৩০ ডিভিশন সৈন্য পাক সেনাদের চর্তুদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সকল রনাঙ্গানে পাকসেনারা পিছু হটতে শুরু করে, যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লে একসময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পাকবাহিনী। দিশেহারা সেনাপতি আমীর আব্দুল্লাহ্ ৩০ পাঞ্জাব, ২৫ ফ্রান্টিয়ার ফোর্স এবং ২৩ পাঞ্জাবকে কুমিল্লার উত্তর থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিয়োজিত করেন। ডিভিশনের সম্মুখভাগকে সমর্থন দানের জন্য ছিল একটি গোলন্দাজ ফিল্ড রেজিমেন্ট, একটি মর্টার ব্যাটারী ও দু'টি ট্যাংক ব্যাটারী। বিগ্রেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর অধিনায়কত্বে ছিল ৫৩ বিগ্রেড। এই বিগ্রেড ১৫ বেলুচ ও ৩৯ বালুচ নিয়ে গঠিত হয়েছিল, তাদের ফেনী ও বেলুনিয়ার উচ্চ ভূমিতে মোতায়েন করা হয়েছিল।

মুলত ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধে যোগদান এবং বিমান আক্রমণের পুর্বেই মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীকে এখানে কোনঠাসা করে রাখে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কটি ছিল মুক্তিবাহিনী ও

পাকবাহিনীর উভয়ের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩ ডিসেম্বর ভারত এবং মুক্তিবাহিনী যখন নতুন উদ্দীপনায় পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থাপনায় আঘাত হানতে শুরু করল, তখন কুমিল্লা অঞ্চল দিয়ে প্রথম চাপটি পড়ে পাকিস্তানী বিগ্রেডিয়ার আতিকের অধিনস্থ ২৫ ফ্রন্টিয়ারের ওপর। মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের সামনে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার দেশাভ্যন্তরে পশ্চাৎপসরণ করতে চাইলো। কিন্তু অপর পক্ষ অর্থাৎ যৌথ বাহিনী পাক সেনাপতি বিগ্রেডিয়ার আতিকের সৈন্যদের দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে তাদের যুদ্ধের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করলো। মুহূর্তে ২৫ ফন্টিয়ার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর ফাঁদে আটকে গেল।

পাক সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎভাগ অর্থাৎ শালদা নদীর পুর্ব পাড় যৌথবাহিনীর দখলে চলে এল। পাকিস্তান বাহিনী সদর দফতরের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ২৫ ফন্টিয়ার ফোর্সের পতন বিগ্রেডিয়ার আতিফকে অস্বস্তিতে ফেলে ছিলো। ২৫ ফ্রন্টিয়ারের ভাগ্য বিপর্যয়ে ব্রিগেডিয়ার আতিফ এখন চিন্তায় পড়ে গেলেন। যৌথ বাহিনীর অগ্র পদক্ষেপের ধারাটি কী হবে? চাঁদপুর অভিমুখে এগিয়ে যাবে, না কুমিল্লা দখলের জন্য উত্তরাভিমুখে চালিত হবে? প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আতিফ ৩০ পাঞ্জাবের একটি যোদ্ধা টহলদার দলকে পাঠালেন। তারা রিপোর্ট করলো কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ ভাগে কোন মুক্তিসেনা নেই পাকসেনারাও নেই।

২৫ ফন্টিয়ার ফোর্সের একজন হাবিলদার ৪ঠা ডিসেম্বর দুপুরে রণাঙ্গান থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় কুমিল্লায় এসে পৌছায়। তার সংবাদ হল ২টি কম্পানীসহ কমান্ডিং অফিসার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তার সংবাদটি সত্যায়িত করলো অল ইন্ডিয়া রেডিওর একগর্বিত ঘোষণায়। বলা হল, পাকিস্তানি ছয়জন অফিসারসহ একজন ল্যাফটেন্যান্ট কর্ণেল ও দুইশ সৈনিককে যৌথবাহিনী বন্দি করেছে। পাকবাহিনীর জন্য এটা ছিল দুসংবাদ, অপরদিকে চাঁদপুর মুক্ত করার জন্যে যৌথবাহিনীর জন্যে প্রথম সুসংবাদ। পাক বাহিনীর জন্যে এটা ছিলো বড় ধরনের বিপর্যয়। শূণ্যস্থান ভরাটের জন্য ২৩ পাঞ্জাবকে তার বাহু বিস্তারের আদেশ দেওয়া হল। তারা অগ্রসর হতে গিয়ে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রচন্ড বাধা পেল। এক সময় নিশ্চিত হয়ে গেল। ভারতীয় ২৩ পার্বত্য ডিভিশনের ১১ বিহার রেজিমেন্ট লেঃ কর্নেল কেবি সিং এর নেতৃত্বে ও রাজপুত রাইলেসের একটি ব্যাটেলিয়ান লেঃ কর্নেল আর, পি, শর্মার নেতৃত্বে চাঁদপুর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাদের সাহায্যে ভারতীয় ৩০২ বিগ্রেড ও এক রেজিমেন্ট ফিল্ড কামান পাক সেনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

৪ঠা ডিসেম্বর রাতে ২৩ পাঞ্জাব তার আহত সৈন্যদের নিয়ে ডাকাতিয়া নদীর উত্তর পাড়ে দেশের অভ্যন্তরে পশ্চাৎপসরণ করার চেষ্টা চালায় পরের দিন সকালে তারা পশ্চাদপসারন করে। কিন্তু তখন পিছনে আসার কোন কোন উপায় ছিলনা একমাত্র আর্ত্মসর্মপন ছাড়া। কমান্ডিং অফিসার ল্যাফটেন্যান্ট কর্ণেল আশফাক আলী সৈয়দ বিপর্যস্ত সৈনিকদের মনোবল রক্ষার্থে সূর্যাস্তের পর পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন । দিনের বেলায় তার সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জাফর ইকবাল লাকসাম থেকে তাঁর কাছে পোঁছানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাকাতিয়া নদীর দক্ষিণ পাড়ে থেকে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক প্রচন্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। এর অর্থ হল ২৩ পাঞ্জাবের পশ্চাৎপসরনের পথও মুক্তিযোদ্ধারা বন্ধ করে দিল।

মেজর জাফর ও বিগ্রেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর কাছে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক আক্রমনের খবরটি কর্ণেল সৈয়দ জানতে পারেন। তিনি তথ্যটি বিশ্বাস করলেন না । বরং সংবাদ দাতাদের দোষারোপ করে বলেন, তোমরা সর্বত্র মুক্তিদের দেখ? যখন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সৈয়দ জানতে পান মুক্তিসেনারা তার পেছনে আঘাত হানতে প্রস্তুত তিনি তখন সুর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিকেলের মধ্যেই তার ব্যাটলিয়ন সদর দফতর গুটিয়ে ফেলেন। আহতদের ডাক্তারের

হেফাজতে রেখে গ্রামের ভিতর দিয়ে লাকসাম অভিমুখে রওয়ানা হন। অন্যান্যদের তার সাথে লাকসামে মিলিত হওয়ার বার্তা পাঠালেন। মেজর আকরামের অধীনস্থ চৌদ্দগ্রামের অগ্রবর্তী কোম্পানীটিরও পশ্চাৎপসরণের সময় হল না মেজর আকরাম মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। স্থানটি ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ মেজর আকরাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে নিজেই মুক্তিবাহিনীর পকেটে চলে এলেন। তার অনেক সৈন্যকে মুক্তিবাহিনীর হাতে জীবন দিতে হল। মেজর আকরাম নিজেও ছুটন্ত গোলায় ধরাশায়ী হন এবং গুরুতর আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকেন। চাঁদপুরের পথ ধরে রাজধানী ঢাকা পোঁছানো তার জন্যে স্বপ্নই রয়ে গেল।

চাঁদপুর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে

হাজিগঞ্জ মুক্ত হওয়ার পর সেদিন রাতেই (০৮-১২-৭১) পাকবাহিনীর চাঁদপুরে যুদ্ধরত ৫৩ তম বিগ্রেড এবং ১১৭ বিগ্রেডের পতন হয়। নভেম্বরে মুক্তিসেনাদের চাপ বাড়লে মাতাল জেনারেল নিয়াজি নতুন করে মানচিত্রের প্রতি তাকিয়েছিলেন দৃষ্টিপাত অচিরেই ঝাপসা হয়ে যায় চলমান যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকলে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মনোযোগ ছিন্ন করে পালাবার পথ খুঁতে থাকেন। তাকে সহযোগিতা করেন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল রহিম খান । তিনি যৌথ বাহিনীর আক্রমণের সম্ভাব্য পথ হিসাবে কুমিল্লার দক্ষিণ পার্শ্বকে চিহ্নিত করেছিলেন। তখন এই এলাকায় মুক্তিসেনাদের সাথে পাক চতুর্দশ ডিভিশন যুদ্ধরত ছিলো। এলাকাটি প্রস্থের দিক থেকে বেশ প্রশস্ত ছিলো। পাঞ্জাবী জেনারেল নিয়াজি ঘোষিত "নরম তলপেট" এলাকাটির দায়িত্ব প্রাপ্ত মেজর জেনারেল রহিম ৫৩ ও ১১৭ বিগ্রেড কে সম্পূর্ণ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ৮ ডিসেম্বর রাতে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যান। জেনারেল রহিমকে ইয়াহিয়া খানের আমলে একজন সেরা দক্ষ জেনারেল হিসাবে বিবেচনা করা হত সে ধারণা কত ভ্রান্ত ছিলো জেনারে রহিম যুদ্ধের মাঠে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তা প্রমান করলেন। জেনারেল রহিম কিছু স্টাফ অফিসার এবং তার ব্যর্থ অপারেশনাল মানচিত্র নিয়ে ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর ত্যাগ করেন। তিনি তার সদর দফতর মুজাফরফরগঞ্জ থেকে চাঁদপুরে স্থাপন করেছিলেন।

একজন মুক্তিসংগ্রামীর স্মৃতিতে চাঁদপুর শহর মুক্তদিবস ঃ

আজ ৭ ডিসেম্বর ২০০৫ সাল আগামীকাল পূর্ব আকাশ আলোকিত করে যখন সূর্য উঠবে, তখন চাঁদপুরবাসী স্বাগতজানাবে তাদের পঁয়ত্রিশতম মুক্তি দিবসকে। চাঁদপুর ৮ ডিসেম্বর মুক্ত হয়েছে না কি ৯ ডিসেম্বর মুক্ত হয়েছে এ নিয়ে একটা বির্তক আছে। বাংলা নামে দেশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে চাঁদপুর ১৯৭১ সনের ৯ ডিসেম্বর মুক্ত হয়েছে। একথার স্বীকৃতি আছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস গ্রন্থেও একই বর্ণনা দেওয়া আছে। সবচাইতে বড় কথা ২৩তম ভারতীয় পার্বত্য ডিভিশনের এগার বিহার রেজিমেন্টের সাথে বাংলার মাটিতে সতন্ত্র এফ.এফ কোম্পানীর সদস্য হিসেবে আমরা প্রবেশ করেছিলাম প্রিয় স্বদেশে। আমাদের চাঁদপুর প্রবেশের তারিখটি ছিলো ৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাত একটা অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর। নানাজন মুক্ত মুক্ত দিবস নিয়ে নানা কথা বলেন, বাস্তবের বিভিন্ন সূত্র ৯ ডিসেম্বর চাঁদপুর মুক্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর অনেক স্মৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত ছিলাম বলে আমার স্মৃতির ভান্ডারে জমা আছে। এরই মধ্যে গত হয়েছে চৌত্রিশটি বছর।

যুদ্ধের মাঠ থেকে বিদায় ঃ

২১-১২-৭১ তারিখ। পাঠান বাহিনীর সেনারা বিভিন্ন অবস্থানে। একটি প্লাটুন চাঁদপুর হেডকোর্টারে। ৪/৫ দিন পূর্বেই ২নং প্লাটুন হাজীগঞ্জ জুট মিল থেকে অস্ত্র গোলাবারুদসহ ৫টি ট্রাকে করে চাঁদপুর টেকনিক্যাল স্কুল হেডকোয়ার্টারে চলে আসে। এই বাহিনীর সাথে লেখক ও তার সহযোদ্ধারা ছিলেন। ইতোমধ্যে পাঠান বাহিনীর অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরও একত্রিত করা হয়। একটি বিষয় আমার সারা জীবন স্মরণে থাকবে। আমরা যখন ট্রাকে করে বিজয়ীর বেশে হাজীগঞ্জ থেকে সিএন্ডবি সড়ক ধরে চাঁদপুর অভিমুখে আসছিলাম, তখন শ' শ' জনতা নানা প্রকার অভিনন্দন সূচক স্তুতিসহ বিভিন্ন শ্লোগানে শ্লোগানে সারা পথ মাতিয়ে তোলে। নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক, সর্বস্তরের জনতা রাস্তার দু'ধারে দাড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায়ী সংবর্ধনা জানাচ্ছিল। গর্বে আমার মনো-প্রাণ নাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি ধন্য জন্ম আমার স্বার্থক। তাদের ভালোবাসায় ছিল আন্তরিক, হাসিমুখে বিদায় মনে এক নতুন আনন্দ অনুভূতির জন্ম দিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যা পাওয়ার আমি ষোলা আনাই পেয়েছি।

পথে আরো যে দৃশ্য চোখে পড়ল, রাস্তা দু' ধারে পাকবাহিনী কর্তৃক তৈরি পরিখার সবগুলোই এখন খালি। অধিকাংশ পরিখাই ছিল নতুন, হয়তো শত্রুরা ভেবেছিলো যুদ্ধ দীর্ঘ স্থায়ী হবে। তারা এতদিন এ সকল পরিখা থেকে আমাদের উপর আঘাত হেনেছিলো। মুক্তি ও মিত্র দু'বাহিনীর প্রচন্ড মারের কাছে শেষ পর্যন্ত ওরা টিকে থাকতে পারেনি । রাস্তার দু' ধারে বেশির ভাগ বাড়িঘর পাক বর্বর সেনারা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। পোড়া ঘরের মাঝে আবার নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। সদ্য মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে বাঙ্গালীরা আবার শিরদাড়া সোজা করে দাঁড়িছে। শত্রু মুক্ত স্বদেশে উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। নির্যাতিত, নিষ্পোষিত জনগণ আজ আজ বীর বাঙ্গালী মুক্তিসেনাদের সংবর্ধনা জানাতে পেরে খুবই উল্লসিত বোধ করছে। আমাদের ও স্বদেশবাসীর অনুভূতি আজ একই সমান্তরালে । তৃপ্তি অনুভব করলাম। বাড়িঘর ব্যবসা অর্থ সম্পদ আপনজন হারিয়েছে যারা তাতে তাদের দুঃখ নেই, স্বদেশের মুক্তিতো অর্জিত হয়েছে।

এ মাটিতে তারা নতুন করে জীবন শুরু করবে। অনাগত সোনালী ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, এটা আমাদের পরম পাওয়া। এতোদিন গ্রামে-গঞ্জে, বনে জঙ্গালে, নদী নালায় ছিলাম। দেশ আজ স্বাধীন। আমরা ট্রাকের দু' ধারে হাতিয়ার উচু বীরের মত দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। গর্বে অহঙ্কারে আমার মনপ্রাণ শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। অতীতের সব কষ্ট সব দুঃখ আমি ভুলে গেছি। কিছুদিন আগেও এই পথে যারা দর্পভরে বিচরণ করত, দলে মুচড়ের বেড়াতো জনপদের পর জনপদ। আজ চিরদিনের জন্য তাদের পতন ঘটিয়ে আমরা বিজয়ীর বেশে হানাদার কবলিত স্বদেশ পুনঃ দখল করেছি। ''ইতিহাসের বাঁকবদলে চাঁদপুর নামের জনপদ'' শীর্ষক লেখাটি আমি এখানেই শেষ করতে চাইছি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস, যদি কখনও সময় আসে লিখব। নব প্রজন্মের জন্যে লেখকের স্নেহাশীর্বাদ রইলো। বইটি ওদের উদ্দেশ্যেই রচিত। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্যে অনেক উল্লেখ করার মতো বিষয় ও অনুল্লেখ রয়ে গেছে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। ইতিহাসের এই বাঁকে এসে লেখাটি আপতত শেষ হলো।

ইতিহাসে চাঁদপুর (২য় পর্ব এবং শেষ পর্ব)
সমাপ্ত